জোনাকির আলো

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য পাঁচসিকা।

প্রকাশক—শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা-বুক-ষ্টল
২২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

—:❀:—

স্নেহের ভগিনী—

স্বর্গীয়া শ্রীমতী সরসীবালা দেবীর

উদ্দেশ্যে—

দিদি !

গত বৎসর এমন দিনেও ত'

তুই আমাদেরই ছিলি ! কিন্তু আজ তুই

আমাদের মায়া ছেড়ে যেখানে চ'লে গিইছিস্,

সেখানে আমার এ ম্লান—"জোনাকির

আলো"—পৌঁছোতে পারবে না

জেনেও—সাশ্রু নয়নে আমি তা

তোরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

কোরলাম ।

তোর :—

হতভাগ্য—"বড় দা ।"

নিবেদন

——:*:——

পুস্তক প্রকাশ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার কোন দিনই মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের একান্ত অনুরোধ ও আগ্রহ উৎসাহে বাধ্য হইয়া আজ আমার এই—"জোনাকির আলো"—সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। পুরস্কারের আশা মোটেই করি না, তবে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া আমার সমস্ত ভুল ভ্রান্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিরস্কার না করিলেই কৃতার্থ হইব। পক্ষান্তরে,—ইহা পাঠ করিয়া যদি অন্ততঃ একজনও একটু আনন্দ পান, তবে নিজেকে ধন্য মনে ক'রব।

আমার এই তুচ্ছ গল্পের প্রায় অধিকাংশগুলিই বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মালঞ্চ প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং ইহার কয়েকটি গল্প উর্দ্দু, হিন্দি ও ক্যানারীজ-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

পরিশেষে;—আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম, যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ আমার এই—"জোনাকির আলো"—প্রজ্জ্বলিত হইল।

তবে—যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে আমার "জোনাকি——" আজ জীবন পাইল, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া এ স্থলে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কারণ, তাঁহারা নিজের কার্য্য নিজে করিয়াছেন,—ইহাতে প্রাপ্য তাঁহাদের কিছুই নাই।

নিবেদন ইতি।

কালনা।
জেলা—বর্দ্ধমান।
মহালয়া. ১৩২৬।

বিনীত—
গ্রন্থকার।
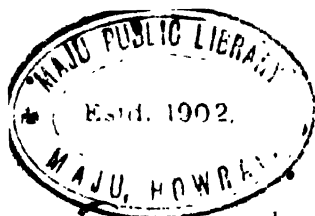
জোনাকির আলো।

মায়ের প্রাণ।

(প্রবাসীর পুরস্কার প্রাপ্ত)

পাঁচ-টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে রমেশচন্দ্র মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল এক্ষণে সে বিমলাকে বাসায় আনিয়া একরূপ সবদিক সামলাইয়া চলিতে পারিবে। সেই দিন হইতে মেসের রান্নাটা রমেশের নিকট নিতান্ত অখাদ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যস্থ প্রবাস-কুটীরের সঙ্গিহীন জীবনটা বড়ই অশান্তিময় বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র পশ্চিমে কোন রেলওয়ে আফিসে চাকরি করে। ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন স্ত্রীকে বাসায় আনিতে পারে নাই; কারণ, অল্প বেতন। এবং তাহার মাতাও কখন পুত্রবধূকে পুত্রের সহিত বাসায় পাঠাইবার চেষ্টা করেন নাই। সে কারণে রমেশ মাতার উপর অনেকদিন হইতে মনে মনে অভিমান পোষণ করিয়া আসিতেছে। রমেশের সংসারে এক বৃদ্ধা মাতা এবং এক মাতৃহারা ভাগিনেয় ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। রমেশ এতদিন স্ত্রীকে বাসায়

জানিতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে মনে মনে স্থির করিল যে, —মা একবার অনুরোধ করিলেই বিমলাকে সে বাসায় লইয়া আসিবে।

ছুটি লইয়া রমেশ বাটী আসিয়াছে। প্রবাসী পুত্র বাটী আসিয়াছে,—মায়ের প্রাণ আনন্দে অধীর হইতেছে। কি করিলে পুত্র সুখী হয়, সেই চেষ্টাতেই বৃদ্ধা মাতা সর্ব্বদা ব্যস্ত। একদিন রমেশ আহারে বসিলে মাতা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, মাছের ঝোলটা কেমন হয়েছে?" রমেশ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল—"মা, মেসে খেয়ে খেয়ে স্বাদ আস্বাদ আর কিছু জ্ঞান নাই, বাড়ী এসে যা খাই—বেশ লাগে।" রমেশের কথাগুলি মায়ের প্রাণে মৃদু আঘাত করিল। কাতরস্বরে মাতা বলিলেন—"মরে যাই বাবা, কি করব বাবা, পোড়া পেট্‌ তো বোঝে না। তা না হলে আজ পেটের দায়ে তোকে বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি!" ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—"তা এক কাজ কর—আমার মাথা খাস্—বৌমাকে এবার বাসায় নিয়ে যা। আর কত কাল কষ্ট করে কাটাবি বাবা!"

মাতার শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে কতকআনন্দে ও কতক লজ্জায় রমেশের মস্তক নত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল মা কি সত্যসত্যই সরল প্রাণে বলিতেছেন, না, আমার মন রাখিবার জন্য

বলিতেছেন! কই এতদিন তো এমন কথা একবারও বলেন নাই!—রমেশ মাতৃস্নেহে সন্দেহ করিল। পরে দুগ্ধের পাত্রটি কোলে টানিয়া লইয়া অভিমানের স্বরে বলিল—"তা কি হয়! তুমি একলা বাড়ীতে কি করে থাকবে!" মাতা—"কেন পারব না বাবা! তুই বিদেশে কষ্টে দিন কাটাবি, আর আমি এখানে সুখে থাকব—তার চেয়ে মরণ ভাল আমার। বাবা, তোরা সুখে স্বচ্ছন্দে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হয়ে বেঁচে থাক্—তাতেই আমার সুখ। আর আমি কিছুই চাই না।"—কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইবার উপক্রম হইল। রমেশ আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—"আচ্ছা তাই হ'বে।" মাতাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই ঠিক করে ফেল্ বাবা—আর অমত করিস্ না।" রমেশ নীরব সম্মতি প্রদান করিল।

দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমলার প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আবার ভাবিল—এটা কি ভাল হবে। বুড়ো মা একা বাড়ীতে থাকবেন; আর আমাকে উনি বাসায় নিয়ে যাবেন।—না, দশের চক্ষে এটা ভাল দেখাবে না।—বিমলা চিন্তা করিতে করিতে রমেশের পরিত্যক্ত আহারপাত্র লইয়া পাকশালে প্রবেশ করিল।

বিমলাকে বাসায় লইয়া কিরূপ ভাবে নূতন সংসার গুছাইবে,

এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে সন্ধ্যার পর রমেশ যখন তাসের আড্ডায় প্রবেশ করিল, অমনি একজন বন্ধু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"কি রে! এবার নাকি গিন্নীকে গলায় ঝুলুবি?"—কথাটা শুনিয়া রমেশ একটু বিরক্ত হইল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেই রকম মতলব করছি তো!"

বন্ধু—"কাজটা কি ভাল হবে! বুড়ো মা বাড়ীতে থাকবে, আর তুই বৌ নিয়ে বাসায় যাবি—!". রমেশ অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—"তার আর কি কচ্ছি বল!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, শরীর অসুস্থ বলিয়া রমেশ তৎ-ক্ষণাৎ তথা হইতে বিদায় লইল। পথে চিন্তা করিতে করিতে চলিল—চারিদিকে বাধা। আমি আমার স্ত্রীকে যেখানে খুসি লইয়া যাই, তাহাতে অন্যের কি? আর ইহারাই বা কি করিয়া জানিল, যে, আমি বিমলাকে বাসায় লইয়া যাইব! বোধ হয় মা বলিয়াছেন। বোধ হয় কেন, মা-ই বলিয়াছেন।—চিন্তা করিতে করিতে রমেশ বাটী আসিয়া পৌঁছিল। আহারান্তে গম্ভীর ভাবে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আজ তাহার মায়ের উপর অভিমানের মাত্রাটা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিমলাকে লইয়া রমেশ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু সামান্য একটা অসম্বন্ধ কারণে অযথা মাতৃস্নেহে সন্দিহান হইয়া, মনে একটা অশান্তি পোষণ করিয়া গেল। ভ্রান্ত রমেশ অনুসন্ধানও

করিল না যে মায়ের প্রাণ কি!—বুঝিতেও চেষ্টা করিল না—মায়ের মনে কি আছে। মূর্খ বুঝিল না—কুটিল সে, না মা!

রমেশ রওনা হইয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিয়া বধূমাতার অভাবটা বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কারণ বিবাহের পর হইতেই বিমলা তাঁহার নিকট ছিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন—"এখন নির্ব্বিঘ্নে তারা বাসায় গিয়া পৌঁছাইলে বাঁচি।" এমন সময়—রমেশের ভাগিনেয়—নিরু নিকটে আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ দিদিমা! মামীমা যে চলে গেল, আমরা খাব কি?"

নিরুর মস্তকে হস্ত রাখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন—"কেন! ভাত খাব!"

নিরু—"কে রাঁধবে?"

বৃদ্ধা—"কেন! আমি?"

নিরু—"তোমার যে কষ্ট হবে!"

বৃদ্ধা—"তা হলেই বা।"—মনে মনে বলিলেন—আমার কষ্ট আমি দেখি না দাদা,—রমেশ আমার সুখে থাক্।

[২]

আজ তিন দিন হইল রমেশ কর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছে। স্বামী স্ত্রীতে অনেক মাথা ঘামাইয়া, যেখানে যে জিনিসটি সাজে সেটি সেইখানে সাজাইয়া, ছোট সংসারটি বেশ গুছাইয়া পাতিয়া লইয়া,

দুইটি প্রাণ এক হইয়া, সেই রেলকোম্পানির সঙ্কীর্ণ বাসাটিতে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে আহারান্তে বিমলা যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—তখন অদূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন্ হইতে ৯টা ১৩ মিনিটের গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেল। রমেশ নিদ্রাগত ছিল। কিন্তু সে নিদ্রা অধিকক্ষণ টিকিল না। বিমলার চুড়ির শব্দেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। বিমলা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। সম্মুখস্থ উন্মুক্ত বাতায়নপথে রমেশ চাহিয়া দেখিল—সুবিস্তীর্ণ অসমতল কঙ্করময় ভূখণ্ড তাহার বিশাল বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছে। সে বক্ষে কি ভীষণ নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে মাঝে মহুয়া ও পলাশ বৃক্ষ তাহাদের মস্তক উন্নত করিয়া নিঝুম দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রকিরণ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া যেন সেই নিস্তব্ধ বক্ষে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। ধূ ধূ— সুদূর প্রান্তে পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্রে, শুষ্ক গুল্ম-লতা বৃক্ষ-শাখা-পত্রের অগ্নি-শিখা অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন পর্ব্বত-শ্রেণী অগ্নিমাল্য পরিধান করিয়া, কাহার প্রতীক্ষায় অনড় অচল হইয়া বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মৃদু হাওয়া সুদূর অরণ্যনিবাসী সাঁওতালগণের বাঁশের বাঁশীর মধুর সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা বহন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমেশ ও বিমলার গাত্রে কি একটা সুখানুভবের শিহরণ জাগাইয়া যাইতে লাগিল। রমেশ দেখিয়া

শুনিয়া মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে নিজেকে বড় সুখী জ্ঞান করিল। আবেগভরে বিমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বিমলা! দেখ —কেমন সুন্দর রাত।" বিমলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"সত্যি —খুব সুন্দর!"

রমেশ বিমলার আরও নিকটস্থ হইয়া, নিজ হস্তের মধ্যে তাহার দক্ষিণ হস্তখানি ধারণ করিয়া বলিল—"দেখ বিমলা, আমি অনেক দিন থেকে ভেবে আস্‌ছি—তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌ব; কিন্তু কি করব বল। মা যদি একদিনও মুখ ফুটে বল্‌ত, তা হলেই তোমাকে নিয়ে আস্‌তাম। আমি ত আর সেধে বল্‌তে পারি না।"

বিমলা রমেশের প্রতি বক্রদৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—"এখন তো এনেছ!"

রমেশ—"এনেছি বটে; কিন্তু মার বোধ হয় আমার উপর মনে মনে রাগ হয়েছে। মা যে খুব সরল মনে তোমাকে পাঠিয়েছে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।"—বলিতে বলিতে রমেশের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। বিমলা রমেশের বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে তাহার অধর-কোণের মৃদুহাসি কোথায় সরিয়া গেল। সে অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল—এ কি? তাহার স্বামী যে তাহার মাতার বিষয়ে এমন কুবিশ্বাস পোষণ করে, তা তো সে জানিত না। সে

জানে তাহার স্বামী মাতৃভক্ত। তাহার পর বিষণ্ণবদনে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"সে কি? তুমি বলছ কি? মা সরলমনে আমাকে পাঠান নাই? একি কখনও হতে পারে? তুমি যাতে সুখী হও মার কি তাতে রাগ হতে পারে! এর আগে আমাকে আন্‌বার জন্য বলেন নাই, কারণ তিনি জানেন তোমার আয় কম। তবে তোমারও এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে—আমাকে বাসায় আন্‌লে, বাড়ীতে একা মায়ের বড় কষ্ট হবে। এই আমাকে বাসায় এনেছ, গ্রামের দশজনে বোধ হয় তোমার নিন্দা করছে!"

বিমলার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রমেশের মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া আর বেশী কিছু বলিতে সাহস করিল না। রমেশ উপাধানের উপর বামহস্ত রাখিয়া, তাহার উপর মস্তক রাখিয়া দক্ষিণহস্তে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া অভিমানভরে বলিল—"তা বেশ, তোমাকে বাসায় এনে যদি অন্যায় করে থাকি, শীঘ্রই না হয় তোমায় রেখে আস্‌ব।" —তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমরা তো সুখে থাকো—আমি না হয় কষ্টে দিন কাটাব।"

কথার ভাবে বিমলা বেশ বুঝিল—রমেশের অভিমান হইয়াছে। সে রমেশের চক্ষুদ্বয়ের উপরিস্থিত দৃঢ়-আবদ্ধ হস্তখানি বলপূর্ব্বক অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"মিছে কেন রাগ করছ? আমি যা ভাল বুঝলাম বল্‌লাম। অন্যায় কিছু বলে

থাকি আমায় ক্ষমা কর। তুমি নিজেই বিবেচনা করে যা ভাল বোঝ কর। আমি বলি মার উপর রাগ না করে' মাকেও বাসায় নিয়ে এস। তা হলে সবদিক্ বজায় থাকবে। (দেখ, মাকে কষ্ট দিয়ে কেউ কখন সুখী হতে পারে নি।) তুমি ত বারমাস বিদেশে থাক, কিছুই জান না। আমি জানি মার প্রাণ তোমার জন্তে কি করে। দুদিন তোমার চিঠি পেতে দেরী হলে, নাওয়া খাওয়া ভুলে পাগলের মত ছুটে বেড়ান। রোজ দুসন্ধ্যে বুড়োশিবের মন্দিরে গিয়ে মাথা খোঁড়েন। তুমি কিনা সেই মায়ের উপর—" ঠিক এই সময় রমেশ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। বিমলা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। রমেশ কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল —"মার চিঠির উত্তর দিয়েছ?"

রমেশ নিদ্রার ভাণ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"না, দিই নি—কাল দেবো।"—আর কোন কথা হইল না। বিমলা সে রাত্রিকার মত শয়ন করিল।

তার পর ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু রমেশের নিকট এ ছয় মাস যেন ছয় মুহূর্ত্তের মত, দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এবং তাহার মাতার নিকট ছয় বৎসর বলিয়া জ্ঞান হইল। কারণ সুখের সময়ের গতি অতি দ্রুত, এবং কষ্টের সময়ের গতি বড় ধীর বলিয়া মনে হয়।

[৩]

ছয় মাস পরে পুনরায় যখন রমেশ বিমলাকে লইয়া বাটীর দ্বারে গিয়া পৌঁছিল, বৃদ্ধা মাতা ছুটিয়া গিয়া গোশকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, যেন তিনি আজ কতদিনের হারান ধন কুড়াইয়া পাইলেন। দুই বিন্দু আনন্দাশ্রুর গতি তিনি কোন মতে রোধ করিতে সক্ষম হইলেন না।

পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া কয়েকদিন বৃদ্ধার বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে রমেশ যখন তাসের আড্ডায় চলিয়া যায়, বিমলা তখন শ্বশ্রূমাতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার অঙ্গসেবা করে। শ্বশ্রূমাতার এক প্রশ্নের সে শত উত্তর প্রদান করে। বৃদ্ধা যদি জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁ মা, সেখানে খাবার জিনিসপত্র কেমন পাওয়া যায়!" - তাহার উত্তরে বিমলা বলে "খাবার জিনিস সবই পাওয়া যায়, কিন্তু বড় আক্রা। ইলিশ মাছটা মোটেই পাওয়া যায় না। মা! ওদেশে মাছকে 'মছলি' বলে। মা! আমি দু-একটা সাঁওতালী কথা শিখেছি। সাঁওতালদের মেয়েরা বন থেকে শাক তুলে এনে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বিক্রী করতে আসত—তাদের কাছে। তারা গরম ভাতকে 'লোলোদাকা' বলে! আর মা জানেন! ওখান থেকে কাশী গয়া খুব কাছে। মা! আপনিও এইবার চলুন না! কেমন কাশী-গয়া দেখে আসবেন!—"

বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন—"আমার বয়াতে কাশী-গয়া দেখা কি আছে মা? রমেশ আমার বেঁচে থাক; অদৃষ্টে থাকে—দেখব।—" বিমলা মিনতির স্বরে বলিত—"না মা, আপনার ছুটি পায়ে পড়ি, আপনি একবার চলুন।"

বৃদ্ধা যখন বুঝিতেন যে, তাঁহার বৌমাটি বড়ই নাছোর-বান্দা তখন অগত্যা বলিতেন—"আচ্ছা, রমেশকে বলে দেখব যদি নিয়ে যায় যাব।—" এইরূপে কয়েক দিন বৃদ্ধার বেশ আনন্দেই কাটিল। কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। রমেশের ছুটি ফুরাইল, যাত্রার শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল। মায়ের প্রাণ যেন কি একটা আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধা মনে মনে ভাবিলেন—আর রমেশকে বিদেশে যাইতে দিব না। অনাহারে মরিব সেও ভাল, তবু রমেশকে আর চোখের আড়াল করিব না। উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের কঠিন তাড়নায় ক্ষণিক আবেগে মাতা মনে মনে যে বন্দোবস্ত করিলেন—অভাবের কঠোর আঘাতে তাহা সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। মাতা ভাবিলেন—'তবু পোড়া পেট তো বোঝে না।'

বধূমাতার অনুরোধে মাতা একদিন পুত্রের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"বাবা রমেশ, তোর ওখান থেকে কাশী-গয়া নাকি খুব কাছে, তা আমাকে একবার নিয়ে চল না; আর কদিন বা বাঁচব! জীবনে কাশী-গয়াটা তো আর হয় নি!"

রমেশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিল—"কে বল্‌লে—ওখান থেকে কাছে? অনেক দূর। তার উপর এখন খরচ-পত্রের টানাটানি—" রমেশের কথাগুলির মধ্যে বেশ একটু উদাসীনতার আভাস প্রকাশ পাইল। কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহা বুঝিতে পারিল না। মাতা বুঝিলেন—সত্যই ত রমেশের আমার খরচপত্রের টানাটানি। রমেশকে কষ্ট দিয়া আমি কাশী-গয়া করিতে যাইব! তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা পুত্রের সুখ শতবার বাঞ্ছনীয়। তাই রমেশের কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন—"না, না, তবে থাক, এখন আর যেতে চাই না।"

নির্দ্ধারিত দিনে বিমলাকে লইয়া রমেশ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

[৪]

মাঘমাসে রেল আফিসের কয়েকটি বাবু সস্ত্রীক পশ্চিমভ্রমণে যাইবার বন্দোবস্তে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে রমেশের মনেও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বিমলার নিকট একদিন মনোভাব প্রকাশ করিল। বিমলা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"পশ্চিমে কোথায় যাবে?"

রমেশ—"মাঘমাসে এলাহাবাদে একটা বড় মেলা হয়। সে মেলাটা একটা দেখ্‌বার জিনিষ। তারপর সেখান থেকে ফিরবার পথে কাশী, গয়া, বিন্ধ্যাচল দেখে আসা যাবে।"

বিমলা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল—"আচ্ছা, তোমার নাকি খরচপত্রের টানাটানি? মা কোন দিন কিছু বলেন না, তিনি কত বড় আশা করে মুখ ফুটে কাশী যেতে চাইলেন—তুমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তোমার খরচপত্রের টানাটানি। আর এখন তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, এ কথা মায়ের কানে পৌঁছিলে তিনি কি মনে করবেন বল দেখি?"

রমেশ—"আমি টাকা খরচ করে বেড়াতে যাচ্ছি না! রেলের পাস্ পেয়েছি।"

বিমলা—"তা বেশ, তবে মাকেও নিয়ে এস। সবাই একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

রমেশ কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া ম্লানমুখে বলিল—"তবে থাক্, আর গিয়ে কাজ নাই।"

স্বামীর ম্লান মুখ দেখিয়া বিমলা মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যবিচার ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিল—"দেখ, রাগ কর কেন? তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমি যেতে রাজি আছি।

রমেশ—"কিন্তু আবার কি? তোমার কোন ভয় নাই। আমি এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—মাকে এ কথা কিছুতেই জান্‌তে দেবো না।"

বিমলার আর কোন জবাব যোগাইল না। সে চুপ করিয়াই

রহিল। কিন্তু কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার শরীরটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

সেই সপ্তাহেই রমেশ বিমলাকে লইয়া পশ্চিমযাত্রা করিল। যাইবার কালীন আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধা মাতার কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইল।

এদিকে বৃদ্ধা মাতা অনেকদিন পুত্রের কোন পত্রাদি না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক দুই দিন করিয়া প্রায় এক মাস হইতে চলিল, তথাপি রমেশের কোন পত্র আসিল না। উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া, টেলিগ্রাম করিয়াও কোন সংবাদ মিলিল না। ডাকপিয়নকে শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও বৃদ্ধা পুত্রের একখানি পত্র পাইলেন না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া পাগলিনীর মত তিনি চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্রি রমেশের একখানি পত্রের জন্য দুর্গা কালীর নিকট মানত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কই? পত্র আসিল না।

একদিন বৈকালে বাহিরের ঘরে গিয়া বৃদ্ধা দেখিলেন জানালায় কাহার একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন রমেশের পত্র। হ্যাঁ, এই তো রমেশের অক্ষর। পিয়ন হয়ত জানালা দিয়া ফেলিয়া গিয়াছে—এই বিশ্বাসে মায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পত্রখানি বক্ষে চাপিয়া দ্রুতপদে এক প্রতিবাসীর নিকট গিয়া বলিলেন—"দেখ তো বাবা;

রমেশ কেমন আছে? নিশ্চয়ই তার অসুখ বিসুখ হয়েছে। তা না হলে সে চিঠি দিতে এত দেরি কখনও করে না।"

প্রতিবাসী পত্র লইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"একি? এ চিঠি তো আজকালকার নয়! এ অনেক দিনের চিঠি।"

মায়ের প্রাণ কিছুতেই বুঝ মানিতে চাহিল না, যে, সেখানা পুরাতন পত্র। বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল করে দেখ বাবা, বোধ হয় আজ কালকার পত্রই।"

প্রতিবাসী বলিল—"না, এ অনেকদিনের—৩রা কর্ত্তিকের।"

বৃদ্ধার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য পায়ের তলে ভূমিকম্পন অনুভব করিলেন। চক্ষে আঁধার দেখিলেন। আহা! তিনি যে কত বড় আশা করিয়া পত্রখানি লইয়া আসিয়াছিলেন। রমেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; মায়ের প্রাণ পুত্রের নিকট যাইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল। হায়, রমেশ হয়ত তখন স্ত্রীকে এলাহাবাদে 'খসরু-বাগ' দেখাইতেছিল।

বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধা গৃহের দাবায় বসিয়া পড়িলেন। তখন কেবলমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে সাঁঝের বাতি জ্বলিয়াছে। বৃদ্ধা আজ সন্ধ্যার বাতি জ্বালিতেও ভুলিয়া গেলেন।

তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—রমেশের আমার হল কি ? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অদূরে ঠাকুর-বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষের মনে ভক্তির আবেগ আনয়ন করিতেছিল। বৃদ্ধা সিক্তচক্ষে ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিল "বাবা নারায়ণ, রমেশের আমার সংবাদ আনিয়ে দাও বাবা। আমি দুধ-ঘি দিয়ে তোমায় নাওয়াব বাবা !"

সারা রাত্রি অনিদ্রার পর ভোররাত্রে তন্দ্রাঘোরে বৃদ্ধা স্বপ্ন দেখিলেন যেন, রমেশ রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে ও মাঝে মাঝে—'মা গো মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। পুত্রের সেই কাতর-ডাকেই যেন বৃদ্ধার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কি একটা ভাবী আশঙ্কায় তাঁহার জীর্ণশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 'ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়' এই বিশ্বাসে মাতা ঠিক বুঝিলেন যে পুত্রের অসুখ হইয়াছে। মায়ের প্রাণ আর তো ধৈর্য্য মানিল না। সেই দণ্ডেই উড়িয়া পুত্রের পার্শ্বে যাইতে চাহিল। বৃদ্ধা স্থির করিলেন—নিরুকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া, সেই দিনই রমেশের নিকট চলিয়া যাইবেন।

[৫]

প্রায় একমাস পরে রমেশচন্দ্র পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া রাত্রি

১২টার গাড়ীতে কর্ম্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে গিয়া নিজ বাসায় প্রবেশ করিল। আজ রমেশের এ ভাব কেন? তাহার মুখে সে আনন্দের ভা নাই। চক্ষে সে প্রফুল্লতা নাই। মুখে-চোখে যেন বিষম একটা নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়াছে। যেন কতদিন অনিদ্রা ও অনাহারে তাহার শরীরটা আধখানা হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সঙ্গে নাই—বিমলা।

পরদিন রমেশ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। সমস্তদিন শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাতরস্বরে কতবার 'মা গো মা' বলিয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্দ্রা ঘোরে কতবার পার্শ্বোপবিষ্ট কাহাকে ধরিতে হস্ত প্রসারণ করিল। ললাটে কাহার শীতল-কোমল কর-স্পর্শ অনুভব করিতে প্রাণে প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু কে কোথায়? আছে,—গৃহকোণে বিমলার অপরিহার্য্য স্মৃতিমাখান, আবরণ আবৃত একটি ষ্টীল্‌ ট্রাঙ্ক। তাহার উপর একখানি আয়না, চিরুণী ও সিন্দুরের কৌটা। তাহার পার্শ্বে দুইখানি ছিন্ন ও শূন্যমলাট পুরাতন প্রবাসী মাসিকপত্র। আর আছে, অর্দ্ধ-শূন্য একটি কুন্তল-কৌমুদী তৈলের শিশি। বিমলার এই শেষ চিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে রমেশের অন্তর-রুদ্ধ বেদনার রাশি প্রবল বেগে উছলিয়া উঠিল। সে দুই হস্তে তাহার শোক-দগ্ধ বক্ষ চাপিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল—এই

জোনাকির আলো।

আমার সাধের বাসা, যেখানে বিমলাকে লইয়া কত যত্নে সুখের খেলাঘর পাতিয়াছিলাম! কিন্তু, দুইদিনে আমার সব ভাঙ্গিয়া গেল। কন গেল! বিমলাই একদিন বলিয়াছিল যে—'মাকে কষ্ট দিয়া কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না।' মা তোমায় কষ্ট দিয়াই ঝ আমার এ সুখ সহিল না। মা! আজ প্রায় এক মাস যে তোমার কোন খবর লই নাই

ভাবিতে ভাবিতে রোগশয্যায় শায়িত রমেশের জ্বরতপ্ত গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু অতি ধীরে গড়াইয়া পড়িয়া উপাধানে মিশিয়া গেল। রমেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল—"উঃ, মা গো।" এমন সময় সে ললাটে কাহার করস্পর্শ অনুভব করিল। সে স্পর্শ কত শীতল, কত শান্তিদায়ক। স্পর্শ মাত্রেই যেন রমেশের সকল যন্ত্রণা কোথায় সরিয়া গেল। চমকিত হইয়া রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার দুর্ব্বল শরীর কাঁপিতে লাগিল। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে সে বেশ দেখিল —শয্যাপার্শ্বে কে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কম্পিত কণ্ঠে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

—"বাবা রমেশ;—আমি: বাবা তোর এমন অসুখ করেছে, তা আমায় একটা সংবাদ দিতেও নাই!"

বিস্মিত রমেশ উত্তর করিল—"এ্যাঁ, কে? মা! তুমি এখন এখানে কেমন ক'রে?—"

কেমন করে, তা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে রমেশ ? সে যে মায়ের প্রাণ! তুমি যে রোগশয্যায় পড়িয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিয়াছ। আর কি মা থাকিতে পারে! পুত্র যদি বিপদে পড়িয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকে, তবে—অসীম ব্যবধানে থাকিয়াও মায়ের প্রাণ যে আপনি কাঁপিয়া উঠে! সে যে সংসারের সার সৃষ্টি—মায়ের প্রাণ!

বৃদ্ধা রমেশের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ একমাস যে তোর কোন খবর পাই নাই। প্রাণ তো আর বুঝ মান্‌লো না—তাই ছুটে এলাম।"

জ্বরতপ্ত হস্তদ্বয়ের মধ্যে মাতার হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া, নত মস্তকে করুণস্বরে রমেশ বলিতে লাগিল—"তা এসেছ বেশ করেছ মা। মা, তুমি বড় আশা করে কাশী দেখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি সে কথা রাখতে পারি নি। চল মা এইবার তোমায় নিয়ে কাশী যাই। আর এখানে থাক্‌ব না। মা, তোমায় কষ্ট দিয়ে, তোমার উপর মিছে অভিমান করে সুখ খুঁজতে গিয়েছিলাম, —কিন্তু তার বেশ ফল পেয়েছি।" বলিতে বলিতে রমেশের কণ্ঠস্বর যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। বৃদ্ধা দুই হস্তে তাহাকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া ভীত কম্পিত স্বরে বলিলেন— "কেন? কি হয়েছে বাবা! পাগলের মত তুই কি বকছিস্‌ আমি

কিছুই বুঝতে পারছি না।—বৌমাই বা গেলেন কোথায়! ঘরে এখনও আলো দেওয়া হয় নাই। ও বৌমা! বৌমা!"

রমেশের বুকের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল। সে মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আর কাকে ডাকছ মা? এখানে কেউ নাই।"

মাতা—"সে কি? বৌমা কোথায়?"

রমেশ—"সে আছে—কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে। আগে বল মা আমায় ঘৃণা করবে না! আমার উপর রাগ করবে না? তা' হলে আমি সব কথা বল্‌ব।"

বৃদ্ধা—'বাবা, সব কথা খুলে বল, তোর কথা শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে!

রমেশ বলিতে লাগিল—"তবে শোন মা। তুমি কাশী যেতে চেয়েছিলে। তোমায় ফাঁকি দিয়ে তাকে নিয়ে আমি পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম! অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে কাশীতে এসে তার কলেরা হল। অনেক চেষ্টাতেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না। মা, জন্মের মত তাকে কাশীতে ফেলে এসেছি। মা, তোমায় ফাঁকি দিয়ে হাতে হাতে তার সাজা পেয়েছি।" রমেশ মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধার প্রথমে ভ্রম হইতেছিল, সে বুঝি বিকারের ঘোরে বকিতেছে। তারপর অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্রন্দন-

বিজড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, এক মাসের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, আমি তার কিছুই জান্‌তে পারলাম না—" বৃদ্ধা পুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজও চন্দ্রকিরণ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে রমেশের আঁধার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বসন্তের মৃদু-হাওয়া দূর অরণ্য-বাসী সাঁওতালদের বংশীধ্বনি আনিয়া রমেশের নীরব-কক্ষে পৌঁছাইয়া দিতেছে। সে বাঁশীর তান আজ বড়ই করুণ লাগিতে-ছিল। তদপেক্ষা অধিক করুণ লাগিতেছিল সেই পার্ব্বত্যদেশের প্রায় পাদপশূন্য বিপুলায়তন ভূখণ্ডমধ্যস্থ রেলওয়ে ষ্টেসনের বিশ্রামা-গারের কোন বাঙ্গালী যাত্রীর মধুর কণ্ঠের বাঙ্গলাগান,—

"—আর ত কেউ চাইলে না ফিরে,
নিশার আঁধার এলো ঘিরে ;—
শেষে মনে হ'ল মায়ের কথা
নয়নের জলে।।"

রমেশ ঠিক মাতৃক্রোড়ের শিশুরই মতই কাঁদিতে লাগিল ; আর বৃদ্ধা তাঁহার মাতৃ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রের এই দারুণ শোকের দৃশ্য দেখিতে আর কেহই ছিল না। কেবল দেওয়াল-গাত্রে রমেশ ও বিমলার এক-খানি প্রতিচ্ছবি সংলগ্ন ছিল—চেয়ারে উপবিষ্ট রমেশের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিমলা [illegible] বিমলা যেন রমশের কানে কানে বলিতেছিল—

জোনাকির আলো

"তুমি আজ মা চিনিয়াছ দেখিয়া আমি মরিয়াও সুখী হইলাম। আমার শেষ কথা, জীবনে কখনও মাতৃস্নেহে সন্দিহান হইও না। মাতৃস্নেহে কৃত্রিমতা নাই। মাতৃবাক্য আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে সর্ব্বদা নতশিরে মানিয়া চলিবে। মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না। তাঁকে সুখী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে নিজেও সুখী হইতে পারিবে।"

রমেশ মায়ের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, ঠিক দুষ্টছেলের মতই কাঁদিয়া কাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া মায়ের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দিশা-হারা।

মাতা যখন মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন, মোহিনীর বয়স তখন দশ, ছোট ভগিনী কমলিনার তিন। পিতা রামচন্দ্র মোদকের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান তাহারা,—বড় আদরের মোহি-কম্‌লি। স্ত্রী-বিয়োগে রাম সংসার অন্ধকার দেখিল। সংসারে দ্বিতীয় মনুষ্য নাই। রামচন্দ্রের চক্ষুস্থির হইল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কোন্ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কোন্ নবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, মোহিনী তাহার কাঁটালতলার, ইঁটে-ঘেরা ধূলা-মাটির খেলাঘর ছাড়িয়া, সত্যকারের রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি, হাঁড়ি-কুঁড়ি বুঝিয়া লইল। পুঁতির মালা গলায় দেওয়া কাচের পুতুল ফেলিয়া, মাদুলি-পরা অত বড় ছোট বোনটুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পিতা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

মোহিনীর একটু বয়সে বিবাহ হইল। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মোহিনী তাহার দুষ্ট ছোট বোনটীকে বুকে ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল, পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া অনেক ফোঁপাইল। তারপর গিয়া গো-শকটে উঠিয়া বসিল। রামচন্দ্র কমলিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। যে-পাড়ে যখন ভাঙ্গন ধরে, তাহা কি আর বাধা মানে? মোহিনীর বিবাহের বৎসর

দুই পরে রামচন্দ্রও স্ত্রীর অনুগমন করিল। তাহার বটতলার মুড়ি-মুড়্কি, খই-চিঁড়ের দোকানটি চির-দিনের মত বন্ধ হইল। মোহিনী শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাইয়া, রান্না ঘরের ভিজে মেঝেয় পড়িয়া সমস্ত দিন কাঁদিল। শাশুড়ী আসিয়া কড়ামিঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"এ কি ক'রছ বাছা? মা-বাপ কিছু চির দিনের নয়, এক দিন-না-একদিন যাবেই। তার জন্যে এত কেন? এবাড়ীর একটা মঙ্গল অমঙ্গল দেখতে হবেত?" মোহিনী চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

কমলি আজ অনাথিনী। তাহার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। স্বামী বীরেশ্বরকে অনেক বলিয়া-কহিয়া মোহিনী তাহার দুঃখিনী কম্লিকে কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে লইয়া আসিল। তাহার পিত্রালয়ের সম্বন্ধ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল।

মোহিনীর শ্বশুরের সংসারে—স্বামী, দেবর বিশ্বেশ্বর এবং বিধবা শাশুড়ী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। এখন কম্লি হইল আর একজন। কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল।

একদিন মোহিনীর চমক ভাঙ্গিল। সে দখিল তাহার স্কন্ধে মস্ত একটা দায়িত্ব। কম্লি? তাহার যে বিবাহের বয়স হইয়াছে। মোহিনী অনেক্ষণ চুপ্ করিয়া কি ভাবিল। তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—"ঠাকুর-পো যদি দয়া ক'রে কম্লিকে বে করে"—মেহিনীর প্রাণে কে যেন বিদ্রূপের

হাসি হাসিল। ইহা কি সম্ভব? হইতেই পারে না। দুরাশা, আকাশকুসুম! তথাপি মোহিনী আত্মহারা হইয়া ভাবিতে লাগিল—"আহা তা যদি হয়, তবে বেশ হয়। ছোটবেলা থেকে দুইটি বোনে বাপের ঘরে খেলা ক'রেছি—শ্বশুর-বাড়ীতেও দুজনে সুখে দুঃখে ঘর করি।—" কিন্তু এ আশা, এ কল্পনা সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিতই পরিত্যাগ করিল।

কম্‌লিকে শাশুড়ীর বড় পছন্দ হইল। একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"আচ্ছা বীরু! এক কাজ ক'লে হয় না? আমার বিশুর সঙ্গে কম্‌লির বে দিলে হয় না? বেশ মানায় কিন্তু?" বীরেশ্বর শাতের মিষ্ট রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়াছিল; গাত্র চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে আরামব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল—"বেশ ত!"

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোহিনী কুটনা কুটিতেছিল। মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণমাত্র তাহার শরীরে যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অন্যমনস্কে বঁটিতে একটা আঙ্গুল সামান্য কাটিয়া গেল। অপর হস্তে কর্ত্তিত আঙ্গুল চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি সত্য? না—স্বপ্ন! যদি এ হয়—বুঝবো কম্‌লির অদৃষ্ট! কিন্তু সে যে বড় অভাগিনী। মোহিনী আর ভাবিতে

পারিল না। তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না, সত্য সত্যই একদিন বিশ্বেশ্বরের সহিত কম্‌লির বিবাহ হইয়া গেল, মোহিনী মাতা-পিতাকে স্মরণ করিয়া, অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে তাহার মস্তক কড়া-মেজাজ শাশুড়ীর চরণে যেন নত হইয়া পড়িল। অনেক দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। কোন্‌ অপরাধে, কোন্‌ বিষম দোষে বলিতে পারি না,—শাশুড়ী দিন দিন মোহিনীর উপর বড়ই রুষ্ট ও নির্দ্দয় হইয়া পড়িল। তৎ-পরিবর্ত্তে ছোট বৌমা—কম্‌লি পাইতে লাগিল—প্রচুর আদর ও অপরিসীম সোহাগ। সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বরও স্ত্রীর উপর একটু কড়া হইয়া মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। শাশুড়ীর হুকুম,—সংসারের সমস্ত কর্ম্মই বড়বৌকে করিতে হইবে,—ছোট বৌমা কিছুই করিতে পারিবে না। তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল, বড় জোর—দুইটা পান সাজা কি এক ফেরো জল গড়াইয়া দেওয়া, এই পর্য্যন্ত। মোহিনী ইহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইল না। এ "ব্যবস্থা সে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইল। সে চাহে না যে—তাহার সেই ছোটবেলাকার কম্‌লি—বোন্‌টি ঠিক 'যা' এরই মত সংসারের সমস্ত খুটিনাটীতে তাহার পায়েপায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সুখে থাক, তাহাতেই মোহিনীর সুখ।

কম্‌লি কিন্তু এ বন্দোবস্তটাকে 'সু' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। কেন? তাহার শরীর ত বেশ আছে। তবে এ অন্যায় বিচার কেন? একলা দিদি সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিয়া মরিবে, আর সে বসিয়া বসিয়া দেখিবে, না'তাহা কম্‌লি পারিবে না। যে দিদি মায়ের মত সোহাগ-স্নেহে ঢাকিয়া, বুকে কাঁধে করিয়া এতটুকু থেকে এতবড় করিয়াছে, সেই দিদি অন্যায় বিচারে নির্য্যাতন ভোগ করিবে, আর—কম্‌লি, আদরের ছোট বৌমা—অতিরিক্ত সোহাগ-স্নেহ, আদর-আব্দার অধিকার করিয়া থাকিবে;—না, কম্‌লি তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। এ কথা চিন্তা করিয়া কম্‌লি বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল; লজ্জায়, ক্ষোভে সে এতটুকু হইয়া গেল; দিদির দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপরাধীর মতই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

'যাকে দেখ্‌তে নারি—তার চলন বাঁকা' ক্রমে ঠিক তাহাই হইল। মোহিনী এখন ভাল করিলেও শাশুড়ীর চক্ষে মন্দ হইতে লাগিল। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়েই শাশুড়ীর "পোলো পোলো, ছুলো ছুলো। কোথাকার হতচ্ছাড়া বৌ গা?" ইত্যাদি কর্কশ চীৎকারে মোহিনী সর্ব্বদাই পীড়িত হইতে লাগিল; অথচ সে নিজের দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না। এ অত্যাচার, এ অন্যায় তিরস্কার মোহিনী চুপ্‌ করিয়া সহ্য করিতে লাগিল। যখন অসহ্য হইত, তখন শাশুড়ীর চক্ষুর অন্তরালে গিয়া

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনের ভার লাঘব করিবার বৃথা চেষ্টা করিত। কম্‌লি অনেক দিন দিদির পক্ষে দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছে ;—কিন্তু শাশুড়ীর কট্‌মটে চাহনীতে তাহা চাপিয়া গিয়াছে।

মোহিনী এখন একটি পুত্রের মাতা। তাই সে আর বড়-বৌমা বা বড়বৌ নহে। এখন তাহার ডাক-নাম হইয়াছে 'নেদোর মা।' আর কম্‌লি,—যে ছোট-বৌমা সেই ছোট-বৌমাই আছে। বরং আজকাল ডাকটিকে একটু মিষ্ট করিবার নিমিত্ত শাশুড়ী বেশ স্পষ্ট, নাকি-সুর প্রয়োগ করিয়া থাকে।

[২]

ওয়াক্‌—থু-থু-থু। অর্দ্ধ-চার্ব্বিত পান ফেলিয়া দিয়া বিশ্বেশ্বর ঘটির জলে কুলকুচা করিল। প্রকাণ্ড এক কলসী জল কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে মোহিনী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া, বিশ্বেশ্বরের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো ঠাকুর-পো ?"

মা-কালীর মত খানিকটা জিভ্‌ বাহির করিয়া গামোছা দিয়া খানিকক্ষণ জিভ ঘসিয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর উত্তর করিল—"যা হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। পানে চুণ আর নূন দুই ই বেশী হ'য়েছে।"

জলের কলসী নামাইতে নামাইতে মোহিনী বলিল—"চুণ না

হয় বেশী হ'তে পারে, নুন এলো কোথেকে ?" "তা তোমরাই জান।" বিশ্বেশ্বর পুনরায় জিভে গামোছা ঘসিতে লাগিল।

"কি জানি ভাই, তোমার গিন্নীই আজ পান সেজেছে।"—মোহিনী সরিয়া গেল।

"কি রে বিশু ?"—গৃহের দাওয়া হইতে মাতা উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল। বিশু মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"বিশেষ কিছু নয়। তবে আজকাল তোমার বৌয়েরা পানেও নুন দিতে ধরেছে।"

"সে কি রে ? পানে নুন ? নুনে-পানে বিষ হয় যে—নুনে-পানে বিষ! ভাল ক'রে মুখ ধুয়ে ফেল। খানিকটে তেঁতুল গুলে খেয়ে ফেল" বিশু ততক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে।

"কি সর্ব্বনেশে বৌ গো ? কোন্ দিন আমার বাছাদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে। যে কাজে যাবে, একটা না একটা কাণ্ড কর্‌বেই। আমার কিছুতেই বিশ্বেস নেই গো—আমার কিছুতে বিশ্বেস নেই!—" শাশুড়ী নিজমনে বকিয়া যাইতে লাগিল। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে এ বাক্যবাণ বর্ষিত হইতেছিল—শাশুড়ীর পার্শ্বোপবিষ্টা ছোট-বৌমা তাহা বেশ বুঝিতে পারিল; সে ধীরে-ধীরে বলিল—"আজ ত দিদি পান সাজেনি—আমি

সেজেছি।" একটু গরম মেজাজে শাশুড়ী বলিল—"তুমি আবার কখন স্বাজ্‌লে ?"

কাপড় ছাড়িয়া, ভিজা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে মোহিনী আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা; ও-ই আজ পান সেজেছে,—আপনি যখন ঘাটে গিইছিলেন—তখন।"

চোখ রাঙ্গাইয়া শাশুড়ী বলিল—"ও কি নূন দিয়ে পান সেজেছে ? তোমারই কাজ। তোমার হাতে-পায়ে কথা কয়, নূন-মসলা আন্‌তে গিয়ে পানে নূন ফেলেছ।"

নতমুখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কম্‌লি বলিল—"না মা, দিদি আজ নূন-মস্‌লা আন্‌তে যায়নি। বোধ হয় আমারই হাত-টাত লেগে কি রকমভাবে পড়েছে।"

কথায় বলে—"একজন আছে সর্ব্বনাশী, সকলে মিলে তারেই দূষী।" সংসারে কাহারও দ্বারা কোন ত্রুটি হইলে, সে দোষটা শেষ পর্য্যন্ত গিয়া চাপিত ঐ নেদোর-মার স্কন্ধেই। পানে নূন মিশাইয়া বিষ প্রস্তুত করিবার অপরাধে অপরাধী সেই নেদোর-মা-ই—শাশুড়ীর মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ঐ ন্যাকা-বোকা কম্‌লিটা সে দোষ মাথা পাতিয়া লইতেছে কেন ? —রাগে গস্-গস্ করিতে-করিতে শাশুড়ী বলিল—"আমি অত কথা শুন্‌তে চাই না। আমি দেখবো কোথায় পান আর কোথায় নূন।" এক লম্ফে উঠিয়া দুম্ দুম্ করিয়া শাশুড়ী

গৃহে প্রবেশ করিল। মোহনী ও কম্‌লি তাহার অনুসরণ করিল।

মাটির দেওয়াল, খড়ের চালার ঘর; তাহাতে জানালা একরূপ নাই বলিলেই হয়। দিবালোকের গৃহ-প্রবেশ নিষেধ। পশ্চিম দিকে যে একটা ঘুল্‌ঘুল জাতীয় জানালা ছিল, ক্রুদ্ধা শাশুড়ী গিয়া তাহার আবরণ ধরিয়া সজোরে মারিল এক টান্। রুয়ে খাওয়া তক্তাখণ্ড ঝর্‌ঝর্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফাঁক হইয়া গেল! দেখা গেল—পানের ডাবোরের পাশে নূনের পাত্রটি পড়িয়া আছে, নূন ছড়াইয়া গিয়াছে। উত্তেজিত কণ্ঠে শাশুড়ী বলিল—"এই দেখ নুনের পাত্তোর এখানে আসে কি কোরে?"

হাঁড়ি-কলসীর ফাঁক হইতে একটি বিড়াল "ম্যাও" করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিল। আগ্রহ-সহকারে কম্‌লি বলিল—"ও মা? তাহলে বোধ হয় বেড়ালে ফেলেছে!"

হাত মুখ ঘুরাইয়া শাশুড়ী বলিল—"বেড়ালে ফেলেছে না—পদ্মা-পারের পদি পিসি ফেলে গ্যাছে! ঐ নেদোর-মা! আমি চেঁচিয়ে বোল্‌তে পারি—আর কেউ নয়—ঐ নেদোর-মা।"

"সত্যি বল্‌ছি মা—আমি এর কিছুই জানিনে। ও-ই আজ পান সেজেছে; ও কি কোরেছে আমি কি ক'রে জানবো!" মোহিনী মাথা হেট্ করিল। করুণ কণ্ঠে কম্‌লি কহিল—"দিদি বোধ হয়

'আজ এ ঘরেই আসেনি—তবে কেন আপনি শুধু-শুধু দিদিকে' —চীৎকার করিয়া শাশুড়ী ধম্‌কাইয়া উঠিল—"তুমি চুপ্‌ কর। দিদি! দিদি! দিদি! দিদি নিজে দোষ ক'রে বোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ডাইনে-বাঁয়ে চায় না—এই তো দরদের দিদি তোমার। আমি হ'লে অমন দিদির দিকে ফিরেও তাকাইনে। পরম শত্রুরও যেন অমন দিদি না হয়।" ক্ষিপ্র-পদবিক্ষেপে শাশুড়ী চলিয়া গেল। স্থির নিস্পন্দ অবস্থায় মোহিনী ভাবিতে লাগিল—তাহার অপরাধের কে বিচার করিবে? কে তাহার নালিশ শুনিবে? কোন্ অকাট্য প্রমাণে, কোন বিশিষ্ট উপায়ে সে তাহার কঠিন শাশুড়ীকে বুঝাইবে যে,—"ওগো আমি নিরপরাধ। আমি কিছুই জানিনে।" শত বার, সহস্রবার বলিলেও শাশুড়ী তাহা বুঝিবে না। এ অন্যায় তিরস্কার, এ অবিচারের দণ্ড তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। কেন? কেন?—মোহিনীর অন্তরের দুঃখের বেগ আজ দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করিয়া শাশুড়ার এ অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিতে মুহূর্ত্তের জন্য চেষ্টা করিল—কিন্তু, মোহিনা ঠিক যেন এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাদের শান্ত করিল। যাহা জীবনে কখনও হয় নাই, হইতে পারে এ চিন্তাকেও মোহিনী মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ ক্ষণেকের জন্য তাহাই হইল। কম্‌লির উপর তাহার আজ বড় রাগ ও অভিমান হইল। ঐ হতচ্ছাড়ী, পোড়া-মুখী কম্‌লিই যত নষ্টের মূল। ওর জন্যই আজ

এত কাণ্ড। তাই যদি ক'ল্লি, তোর শাশুড়ীকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে না—দোষ দিদির নয়, তোর। মোহিনী আবার ভাবিল—ওরই বা দোষ কি? যত দোষ এই অদৃষ্টের। মোহিনী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কমলি এতক্ষণ দিদির মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়াছিল। এক্ষণে তাহাকে যাইতে দেখিয়া ধীরকম্পিতকণ্ঠে ডাকিল "দিদি!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। মোহিনী ততক্ষণে দূরে চলিয়া গিয়াছে। কমলি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—দিদি হয় ত তাহার উপর রাগ করিয়াছে। কথাটা ভাবিতেও তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একটা আকুল ক্রন্দনের ব্যাকুল চীৎকার যেন তাহার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিল। দিদি তাহার উপর রাগ করিয়াছে। ইহা কি সত্য? হইতে পারে। দিদির কর্ম্মক্লান্ত কম্পিত হস্ত হইতে দিনান্তের একখানি কর্ম্মও কাড়িয়া লইয়া করিবার অধিকার কমলির নাই; উপরন্তু এই অকারণ গঞ্জনা, নির্ম্মম লাঞ্ছনা ভোগ করে দিদি কাহার জন্য? কমলির রাগ হইল—স্বামী বিশ্বেশ্বরের উপর। পানে একটু চুণ লাগিয়াছিল,—তা অত চেঁচামেচি না করিয়া চাপিয়া গেলেই হইত।

"ও ছোট-বৌমা! ছোট-বৌমা?"—শাশুড়ীর চীৎকারে চমকিয়া কমলি গিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। ব্যঙ্গস্বরে শাশুড়ী বলিল—"দিদির সঙ্গে কি পরামর্শ হোচ্ছিল? জোটপাট করে

'দু-বোনে আমাকে মারবে না কি?" কম্‌লির বাক্‌রুদ্ধ হইল। এ কথার সে কি জবাব দিবে? দুই একটা ঢোক গিলিয়া কাঠ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল নীরবের পর শাশুড়ী বলিল—"বোসো, অনেক কথা আছে।" কম্‌লি বসিল।

চাপা-গলায় ধমকান ও ভর্ৎসনার ভাবভঙ্গি করিয়া, হাত-মুখ ঘুরাইয়া কমলিকে শাশুড়ী অনেক কথা বলিল। তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"কেমন? মনে থাকবে ত?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, অনেক কষ্টে কম্‌লি বলিল—"তা কেমন করে পারবো মা! দিদি যদি—"

"সাড়া দেবে না। মোট কথা—আমি যদি কোন দিন দেখ্‌তে পাই,—ভাল হবে না কিন্তু! মনে থাকে যেন।" শাশুড়ী স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কম্‌লি নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ীর কঠোর আদেশে, তাহার অন্তরে এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মহা কোলাহল উত্থিত হইল।—পারবো না, কিছুতেই পারবো না। মনে থাক্‌বে, কিন্তু পারবো না। তাই কি পারা যায়? কেন, দিদির অপরাধ? কম্‌লির গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কোন্ দোষে আজ কম্‌লি তাহার দিদিকে পর ভাবিবে? জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াই সে যাহাকে চিনিয়াছে, যাহার আঁচল ধরিয়া এত বড় হইয়াছে, যাহার যত্নে, যাহার সোহাগ-স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া সে আজ কম্‌লি—শাশুড়ীর বড় আদরের ছোট-বৌমা, সেই মাতৃমূর্ত্তি

দিদিকে সে কেমন করিয়া পর ভাবিবে! দিদি,—সে ত শ্বশুর-বাড়ীর 'পাতান' দিদি নয়। সে যে কমলির ইহকালের, চিরকালের দিদি। কমলি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইহাই কি শাশুড়ীর কর্ত্তব্য? ভালবাসা, সোহাগ, স্নেহে বাঁধা দুজনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একজনকে পায়ে দলিয়া, অপরকে মাথায় তুলিয়া, উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ও শত্রুতার ব্যবধান গড়িয়া, সুখ ও শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির সৃজন করা কি গৃহিণীর কর্ত্তব্য? বুঝি বা ইহাই মানুষের প্রকৃতি! মানুষ অনাদৃত, লাঞ্ছিত একজনকে কেবলমাত্র কথার বিষে দগ্ধ করিয়া, পদদলিত করিয়া শান্তি পায় না। তাই অপর একজনকে আদর আহ্লাদে ঢাকিয়া, মস্তকে তুলিয়া, অনাদৃতের পেষণ-ভারের গুরুত্বটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া কতকটা শান্তি লাভ করে। সে গুরুত্বটুকু যদি অনাদৃত নিঃশব্দে হজম করিয়া লয়, তবে সে মানুষের ঈর্ষানল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, যদি সে গুরুত্বের অনুভূতিতে 'উহু-আহা' প্রকাশ করে, তবেই মানুষের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন হয়।

কমলি কাঁদিতেছিল। কাহার দুইটি কোমল হস্ত তাহার চক্ষু-আবৃত হস্তদ্বয় ধারণ করিল। সে মুখ তুলিয়া দেখিল,—দিদি।

"কাঁদছিস্ কেন লা কমলি? মা কি বকেছে?"

কম্‌লির আবেগ-উদ্বেলিত অন্তরে একটা ক্ষোভ-বিক্ষিপ্ত আর্ত্তস্বর হাহাকার করিয়া উঠিল। দিদির পায়ে মস্তক নোয়াইয়া পড়িল। অদূরে দাঁড়াইয়া শাশুড়ী সমস্তই দেখিতেছিল; কম্‌লি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বজ্র-কঠোর কণ্ঠে শাশুড়ী হাঁকিল—"ছোট- বৌমা!" কম্‌লি নিঃশব্দে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিনা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

[৩]

টগ্‌-বগ্‌ শব্দে ভাত ফুটিতেছে। মোহিনা উননের মুখে জ্বালানি যোগাইয়া দিতেছে। নেদো কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মাতার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মোহিনী উননের নিকট হইতে একটু সরিয়া বসিল। নেদো দুধ খাইতে-খাইতেই মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। মোহিনা তাহার ঘুমন্ত মুখের উপর হইতে এলোমেলো চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিয়া, কপালে সামান্য কাদা লাগিয়াছিল তাহা মুছিয়া দিয়া, কিছুক্ষণ গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর তার মনে পড়িল, কম্‌লির কথা। আচ্ছা, কম্‌লি এখন আমার কাছে আসে না কেন? কথা বলে না কেন? কত দিন, কতবার তাকে ডেকেছি;— সাড়া দেয় না, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চায়, সরে চলে যায়। আমি তার কি ক'রেছি যে—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রলো। বোধ

হয় আমার উপর রাগ ক'রেছে। কই, রাগ হবার মত কিছুই বলিনি ত। তবে কম্‌লি এমন হলো কেন? শাশুড়ীর সঙ্গে ত' খুব ভাব দেখতে পাই। চব্বিশ ঘণ্টাই শাশুড়ীর কাছটিতে বসে আছে। অথচ আমার দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। যে কম্‌লি 'দিদি' ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'তো, সেই কম্‌লি কি না আজ,—মোহিনী এ দুঃখের বেগ কোন মতে সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষোভে, অভিমানে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, চক্ষু ভরিয়া জল উছলিয়া পড়িতে চাহিল।—সেই কম্‌লি,—তখন এতটুকু; সেই বউ-বউ খেলা। ডুরে কাপড়খানি নিয়ে বল্‌তো—"দিদি, আমায় বউ ক'রে কাপড় পড়িয়ে দাও না।"—সেই কম্‌লি!—মোহিনীর আজ অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। দুই ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া নিদ্রিত নেদোর গণ্ডে পড়িল। নেদো চমকিয়া উঠিল। মোহিনী "ষাট্ ষাট্ বলিয়া তাহা মুছাইয়া দিল।

মোহিনীর অজ্ঞাতসারে আসিয়া, মোহিনীর প্রতিই দৃষ্টি ফেলিয়া এক জন অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত; চাহনী উদাস; মুখশ্রী মলিন। কম্‌লি ভয় বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি!" মোহিনী কোন উত্তর দিল না—মাত্র মুখ তুলিল। অপরাধিনীর মতই কম্‌লি বলিল—"দিদি, তুমি বোধ হয় আমার উপর রাগ ক'রেছ!"

"তুই ত আমার বাড়া-ভাতে ছাই দিস্‌নি কম্‌লি—যে রাগ কোরব? তবে দুঃখ হয় যে,—যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, সে আজ ডাক্‌লে সাড়া দেয় না।

"কেন যে সাড়া দিই না, কেন যে তোমার কাছে আসি না,—তা যদি জান্‌তে, তা হলে বোধ হয় তোমার এ দুঃখ হ'ত না দিদি!"

"জান্‌বার দরকার নেই কম্‌লি। তুই চির'দন সুখে থাক, আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো—তাতেই আমার সুখ। তবে একটা কথা ব'লে রাখি—সব দিক বুঝে চল্‌বার চেষ্টা ক'রিস্‌, আর ত, ছেলেমানুষটি নোস্‌!"

মোহিনীর কথার অন্তরালে কতখানি দুঃখ-অভিমান, কতখানি ক্ষোভ আক্ষেপ লুক্কায়িত আছে—কম্‌লি তাহার সমস্তটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, কথাটা তাহার বুকে বড়ই বিঁধিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়'ইয়া দুয়ারের গা খুঁটিতে লাগিল। শাশুড়ী ঘাটে গিয়াছে, এই অবসরে সে দিদির নিকট কি যেন বলিতে আসিয়াছিল,—কিন্তু অভিমান করিয়া দিদি তাহার কথা শুনিতে চাহে না। মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু খসিয়া কম্‌লির নিজ প্রকোষ্ঠের রেশমী চুড়িতে পড়িল! একটা ঢোক্‌ গিলিয়া সে বলিল—"দিদি, তুমি যদি আমার উপর রাগ কর, তবে আর আমি কার মুখ—"

"এমন ভোলা মন, গামছাখানা নিতেও,—ছোট-বৌমা!" শাশুড়ী আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। কম্‌লির মাথায় বাজ পড়িল। ছুটিয়া গিয়া সে শাশুড়ীর সম্মুখে চোরের মত দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে শাশুড়ী বলিল—"ওখানে কি কোচ্ছিলে?" কম্‌লি নিরুত্তর।

"আর বোল্‌তে হবে না গো, বুঝেছি। বেশ—বেশ। বলে —'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।' 'আমে-দুধে মিশে গেল, আঁস্তাকুড়ের আঁটি আঁস্তাকুড়ে র'লো।' ভাল। একবার, দুবার, তিনবার। দেখি আর কিছুদিন। কিন্তু বাছা, এই ব'লে রাখছি'—কোন দিন যদি শুন্‌তে পাই যে—'দিদি আমাকে বোকেছে। দিদি আমাকে অমুক কোরেছে। তবে ভাল হবে না"—স্কন্ধে একখানা গামছা ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া শাশুড়ী ঘাটে চলিয়া গেল। কম্‌লি ছুটিয়া গিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। একি হইল? ইহা অপেক্ষা যে কম্‌লির মরণ ভাল ছিল। এই কি শাশুড়ীর আদর? এই কি শাশুড়ীর সোহাগ? স্পষ্ট করিয়া শাশুড়ী যাহা বলিয়া গেল—তাহাতে যেন বুঝায়, কম্‌লি তাহার দিদির বিরুদ্ধে শাশুড়ীর নিকট সদা-সর্ব্বদা নালিশ করিয়া থাকে। মোহিনী যদি শুনিয়া থাকে, তবে কি মনে করিবে? কেমন করিয়া কম্‌লি তাহার দিদিকে মুখ দেখাইবে? ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল; সে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রান্না-

ঘর হইতে মোহিনী শাশুড়ীর চীৎকার শুনিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। হাতের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

[৪]

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুখখানা ভার করিয়া, যেন খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে কমলি শাশুড়ীর পাকাচুল তুলিয়া দিতেদিতে বলিল—"মা, আজ সকালে দিদি,"—ঠিক সেই সময় মোহিনী সেখানে উপস্থিত হইল। কমলি কি বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া দিদির মুখের দিকে তাকাইল। মোহিনীও মুহূর্ত্তের জন্য কমলিকে দেখিয়া লইল; কিন্তু সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। পায়ের নীচে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের যা কিছু সমস্ত যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে লাগিল। মোহিনী দেওয়াল-গাত্রে দেহভার রক্ষা করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে কি জন্য আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গেল। শাশুড়ী রুক্ষস্বরে বলিল—"কি?" মোহিনী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"এবেলা কি রাঁধবো? মাছ ত নেই।"

"কেন? মাছ কি হ'লো?"

"ঢাকা ফেলে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।"

"বেশ হ'য়েছে। লক্ষ্মীমন্ত বৌ। এই আক্রার মাছ! যা হয় করোগে বাছা—আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না; আমি

কিছু জানিনে।" —শাশুড়ী মুখ ঘুরাইয়া বসিল। মোহিনী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সমস্ত কর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্য, শাশুড়ীর ভৎর্সনা—মোহিনী সব ভুলিয়া গেল। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার প্রাণে কেবল একই কথা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কম্‌লি শাশুড়ীকে তাহার নামে কি বলিতেছিল—আজ সকালে সে কি করিয়াছে? কই কিছুই ত করে নাই। তবে কিসের নালিশ? যে সন্দেহ, যে অবিশ্বাস মোহিনী সে দিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল,—আজ তাহা পুনরায় সশস্ত্র সৈন্যের ন্যায় তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তবে কি কম্‌লি মোহিনীর নামে শাশুড়ীর নিকট লাগায়-পড়ায়? সেই জন্যই কি মোহিনী শাশুড়ীর বিষ-নজরে পড়িয়াছে? আর ইহার বিনিময়ে কম্‌লি শাশুড়ীর আদর-আহ্লাদ অধিকার করিয়া লয়! ইহাই বুঝি যাতৃ-পদের চিরাধিকৃত ধর্ম্ম। কম্‌লি কি সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছে? অসম্ভব। এ চিন্তায় মোহিনী নির্জ্জন স্থানেও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এ সন্দেহকে সে জোর করিয়া দুপায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল; কিন্তু সন্দেহ তাহাকে ছাড়িল না। মোহিনী ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। ফলে কম্‌লির উপর অভিমানের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়া গেল।

মোহিনী চলিয়া যাইবার পর শাশুড়ী বলিল—"তারপর কি বল্‌ছিলে ছোট বৌমা?"

নিকটস্থ একটা পিতলের কলসী দেখাইয়া কম্‌লি বলিল—"হ্যাঁ, এই ঘড়ার এক ঘড়া জল নিয়ে, দিদি আজ সকালে ঘাটে আছাড় খেয়েছে। কোমরে বোধ হয় বেশ লেগেছে, তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌ছে! তাই বোলছিলাম—এ বেলা আমি রাঁধিগে।"

সন্দিগ্ধভাবে শাশুড়ী বলিল—"কি কোরে জানলে?"

"ও বাড়ীর বামুনদিদি বলছিলেন। তিনিও তখন ঘাটে ছিলেন।"

কলসীটা নিরীক্ষণ করিতে করিতে শাশুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা কি হবে? তাই ত বটে! দেখেছ—ঘড়াটা একবারে গেছে। তুব্‌ড়ে মুব্‌ড়ে দফা রফা হয়ে গেছে। আমিও তাই ভাব্‌ছি—ঘড়াটা এমন হোল কেন?"—যদিও ঘড়াটার কিছুই হয় নাই।

"আলক্ষ্মী গো আলক্ষ্মী। হাতে পায়ে কথা কয়। তবুও—যদি বাপের বাড়ী থেকে দু'দশটা আনৃতো! বাসি আথার ছাই। জল খেতে একটা ফুটো ফেরোও দেয়নি।" শাশুড়ী চীৎকার করিতে লাগিল। কমলির হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হইবা গেল, শরীর অবস হইয়া গেল। বজ্রাহতের ন্যায় অনড় অচলভাবে বসিয়া শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিসে কি হইল। আসল কথা চাপা পড়িয়া সামান্য অছিলায় শাশুড়ী মোহিনীকে

ভৎসনা করিতে লাগিল। বাপের কথা উত্থাপনে, কম্‌লির বুকে বড়ই বাজিল। অস্পষ্ট চিত্রের মত বাল্য-স্মৃতিগুলি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দিদির সহিত যে তাহার কতখানি সম্পর্ক, তাহা যেন সে আজ পুনরায় নূতন করিয়া উপলব্ধি করিল। শাশুড়ীর আদর আহ্লাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাহার অন্তরে এক দাবানল প্রজ্বলিত করিল। বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি শাশুড়ীর নিকট হইতে ছুটিয়া গিয়া দিদির পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়া বলে—'দিদি গো! সুধু রাগ ক'রে চুপ ক'রে থাকলে হবে না। আমায় শাস্তি দাও। তোমার এ লাঞ্ছনা, এ গঞ্জনা আমারই জন্য! আমায় সাজা দাও দিদি।' কিন্তু দিদি তাহাকে কত দিন বলিয়াছে—'শাশুড়ী পরমগুরু। তাঁকে অমান্য করতে নেই।' কাঠের পুতুলের মতই কম্‌লি বসিয়া রহিল।

পাকশালা হইতে মোহিনী শাশুড়ীর সমস্ত কথাই শুনিতে পাইল। সন্দেহের বশে মনে করিল—এ নালিশ বোধ হয় কমলিরই। কম্‌লির উপর তাহার রাগ ও অভিমান আরও অনেক বাড়িয়া গেল!

[৫]

মোহিনীর মাথাটা আজ ঠিক নাই। জল কম হেতু ভাত

খরিয়া গেল। ফেন্ গড়াইবার সময় পা সামান্য পুড়িয়া গেল; কিন্তু সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বীরেশ্বর আসিয়া দেখিল, তখনও কি ভাজা হইতেছে। তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। "এখনও রান্না হয়নি? কখন ব'লে গিইছি!"—ইত্যাদি নানারূপ গলাবাজি ও হুঙ্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

মোহিনী কি যেন ভাজিতেছিল। বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া নেদোটা জোর-গলায় কান্না সুরু করিয়াছে। অপর গৃহ হইতে শাশুড়ী চীৎকার করিতেছে—"ওগো ছেলেটাকে একবার নাও। দোহাই তোমার।" ইত্যাদি। চার চারটা বিড়ালে মোহিনীকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। কোন কিছু মুহূর্ত্তের জন্য আলগা রাখিবার যো নাই। চার দিকের চীৎকারে, ভৎ-সনায়, তাড়নায় মোহিনী নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করিল। কাতর, অস্ফুটস্বরে মোহিনী বলিল—"মাগো, আর পারি না—মরণ হ'লে হাড় জুড়োয়।"

নেদোর কান্না আর থামে না। কমলি শাশুড়ীকে বলিল—"মা, আমি না হয় নেদোকে নিয়ে আসি।"

"কেন, ওর মা কি কোচ্ছে?"

"বোধ হয় হাত জোড়া আছে।"

"থাকলেই বা। যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না?"

কম্‌লি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল না। নেদোর কান্নার আওয়াজে মোহিনী এ সব কথা কিছুই শুনিতে পাইল না।

নেদোটা কাঁদিতে-কাঁদিতে একেবারে দাওয়ার কিনারায় আসিয়া পড়িল। শাশুড়ী চেঁচাইয়া উঠিল—"পোলো, পোলো। ওগো তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, ছেলেটাকে একবার ধর।" মোহিনী তাড়াতাড়ি উনানের উপর হইতে কড়াই নামাইয়া ঢিপ্‌ করিয়া রাখিল। কড়াইয়ের তপ্ত আংঠায় তাহার বাঁ হাতে ছ্যাঁকা লাগিয়া গেল। এদিকে নেদোও ঢিপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেল। ছুটিয়া মোহিনী বাহির হইয়া আসিল; দেখিল—শাশুড়ীর পাশে ছোট-বৌ হাঁ করিয়া নেদোর দিকেই তাকাইয়া বসিয়া আছে। কম্‌লি ভাবিতেছিল—শাশুড়ীর না হয় দিদির উপরই রাগ, নেদো তার কি করেছে? মোহিনীর বড় দুঃখ হইল—কম্‌লির যত রাগ না হয় তাহার উপরেই; কিন্তু, নেদো কম্‌লির কি করিয়াছে। মোহিনীর যত রাগ হইল সেই নেদোটার উপরেই। ছুটিয়া গিয়া সে ভূলুণ্ঠিত নেদোর পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়া কোলে তুলিয়া লইল। এই দৃশ্যে শাশুড়ী সপ্তমে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"ওরে আমার কেরে, ছুটো আম্‌ড়া ভাতে দেরে। সোণা থুয়ে আঁচোলে গেরো। ছেলের গায়ে হাত? উনি আমার স্বগ্যের সিঁড়ি—আমাদের রাজা কোরবেন। হারামজাদি, বজ্জাত।"

বাড়ীতে চীৎকার শুনিয়া বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর কোথা হইতে

ছুটিয়া আসিল। মোহিনীর আজ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সংসারের অবিচারে, অত্যাচারে সে আজ সত্যসত্যই আত্মহারা, দিশাহারা হইল। বীরেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এমন ক'রে আর কষ্ট দিও না। তার চেয়ে ঐ বঁটিখানা নাও,—এ জঞ্জাল একেবারে চুকিয়ে দাও।"—উন্মাদিনীর মত আলুথালু বেশে মোহিনী নিকটস্থ বঁটি আনিতে ছুটিল। বিশ্বেশ্বর সেখানা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ছি বৌদি, তুমি ক্ষেপলে না কি ?"

"না ঠাকুরপো, আমার আর সয় না। আজ আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।"—রাগ না—চণ্ডাল। হাতের কাছেই ছিল একখানা ছোট পিঁড়ি, চোখের নিমেষে সেইখানা ধরিয়াই মোহিনী নিজের মাথায় সজোরে এক ঘা মারিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে কম্‌লি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো দিদি গো, কি সর্ব্বনাশ কোর্‌লে গো!" শাশুড়ী আরম্ভ করিল—"কি খুনে বৌ গো! বাপের জন্মে এমন বৌ দেখিনি গো! রক্ত দেখে আমার শরীর কেমন কের্‌ছে। গা ন্যাকার-ন্যাকার কোরছে। ও ছোট বৌমা! এখানে এসে আমার মাথায় একটু হাওয়া কর।"

অতিরিক্ত রক্তপাতে শরীর অবসন্ন হওয়ায় মোহিনী লুটাইয়া, পড়িল, ক্রমে অচেতন হইল। বিশ্বেশ্বর জলপটি বান্ধিয়া রক্ত বন্ধ

করিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মোহিনীকে তাহার ঘরে শোয়াইয়া দিয়া, বারান্দায় আসিয়া সে গুম্ হইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর আঙ্গিনায় পায়চারী করিতে লাগিল। মাতা করুণকণ্ঠে বলিল—"কি কুক্ষণে আজ রাত পুইয়েছিল—রাঁধা ভাতে কাটি পোল না।"

কম্‌লি তাহার ঘরে বসিয়া মনে মনে ভাবিল—সে আজ কাহারও কথা শুনিবে না। কোন বাধা, কোন মানা মানিবে না। সকল আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সে আজ দিদির পাশে গিয়া বসিবে! কম্‌লি শাশুড়ীর নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে-করিতে নিজেই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল।

[৬]

কম্‌লির যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শাশুড়ী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া কম্‌লি গিয়া মোহিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। গভীর রজনীর ভীষণ নিস্তব্ধতায় তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, অথচ সহসা গৃহে প্রবেশ করিতেও সাহসে কুলাইল না। চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। মুকুলঢাকা আমের গাছে ও ফুলে-ছাওয়া শজিনা গাছের কোলে জমাট বান্ধা অন্ধকারে জোনাকীর মেলা বসিয়া গিয়াছে। লেবুফুলের গন্ধেভরা শীতল সিক্ত মৃদু হাওয়া আসিয়া গাছগুলিকে কাঁপাইয়া যাইতেছে। আর খইয়ের মত শুভ্র ছোট শজিনা ফুল-

গুলি ঝুর-ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের ফাটল হইতে পেচার ডাকে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। আর পূর্ব্বাকাশে প্রভাতী-তারা ধক্ ধক্ জ্বলিয়া অন্ধকারের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছে। ধীরে-ধীরে কম্‌লি ভেজান-দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহকোণে তখনও একটি আলো জ্বলিতেছিল। ধীরে, অতি ধীরে গিয়া কম্‌লি মোহিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। গায়ে হাত দিয়া দেখিল —উঃ! গা যেন আগুন।

কম্‌লির করস্পর্শে মোহিনী চোখ মেলিয়া ক্ষণকাল কম্‌লির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অভিমানে তাহার অশ্রু উছলিয়া উঠিল। কম্‌লি ডাকিল—"দিদি!"

"কে? ছোট-বৌ নাকি? কেন? আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছ না কি?"

উঃ! ইহা অপেক্ষা বোধ হয় বজ্রাঘাত কম্‌লি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত। দিদির কথাগুলি তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া শেলের মত বিঁধিল। কম্‌লি কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"দিদি, আগে আমার কথা শোন, তারপর আমাকে যে শাস্তি দেবে, আমি মাথা পেতে নেবো। আমার—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মোহিনী বলিল—"কোন কথা আর শুন্‌তে পারবো না কম্‌লি! আমি কালা হয়েছি। কোন কথা বুঝবেনা!—আমি অবুঝ হইছি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে—যাকে

এই বুকে শুইয়ে মানুষ ক'রেছি, মুখের গ্রাস খাইয়ে বড় ক'রেছি—সে আজ আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রেছে। আমার নামে নালিশ—ক'রতে ধ'রেছে। কেন না—এখন সে আমার 'যা,'—আর কোন সম্বন্ধ নেই।"—বলিতে বলিতে মোহিনী ক্লান্ত হইয়া পড়িল। "উঃ মাগো—" বলিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কম্‌লি দিদির বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"দিদি, না শুনলেও, না বুঝলেও, আজ আমি সকল কথা ব'লে খালাস হবো। কেন যে তোমার সঙ্গে কথা বলি না, তা একদিন তোমায় বোল্‌তে গিইছিলাম; কিন্তু তুমি শোননি। দিদি, শাশুড়ীর বড় দিব্যি—আমি যদি তোমার কাছে যাই, তোমার সঙ্গে কথা কই, তবে আমার ভাল হবে না। উঃ দিদিগো, সে দিব্যি আমি মুখে আন্‌তে পারবো না। এখন বল দিদি, আমার দোষ কি? আর কবে আমি কার কাছে তোমার নামে নালিশ কোরেছি?" কম্‌লি কাঁদতে লাগিল।

মোহিনী অতি কষ্টে ধীরে-ধীরে বলিল—"চুপ কর্ কম্‌লি, চুপ কর্। আমার শরীর অস্থির ক'রছে। মাথা কেমন ক'রছে। উঃ বড় তেষ্টা কম্‌লি, একটু জল—।"

মুখের উপর ঝুঁকিয়া মুখে জল দিতে গিয়া কম্‌লি শিহরিয়া উঠিল। এ কি? মস্তকের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিয়া বালিশ-

বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারার মতই রক্ত-ধারা বক্ষে গিয়া পড়িতেছে। কমলি ভীত কণ্ঠে ডাকিল,—"দিদি, ও দিদি, দিদি গো?" কিন্তু কোন সাড়া নাই! মোহিনী একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল।

কমলি মোহিনীর বুকে হাত দিয়া ডাকিল—"দিদি গো!" মুখে মুখ দিয়া বলিল—"একটা কথা বল দিদি, আর রাগ ক'রে থেক না দিদি।"—কিন্তু মোহিনী নীরব, নিস্পন্দ। "ও গো, কি হ'লো গো" বলিয়াই কমলি তাহার সেই আজন্মপরিচিত দিদির বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। অপর গৃহ হইতে শাশুড়ী ডাকিল "ছোট-বৌমা?"

তখনও গৃহের বদ্ধ বায়ুতে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—'ও দিদি—দিদি গো।'

সমস্ত রাত্রি গ্রাম্য থিয়েটার দেখিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বীরেশ্বর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে আজ "বঙ্গবধূ" অভিনয় দেখিয়াছে; অনুতপ্ত স্বামী শেষে উপেক্ষিতা স্ত্রীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছে। এ দৃশ্য বীরেশ্বরের নিকট বড়ই মধুর লাগিয়াছে। তাই সে মনে-মনে স্থির করিয়া চলিয়াছে—সেও আজ তাহার লাঞ্ছিতা স্ত্রীর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিবে।

অপর রাস্তা দিয়া একটি বালক থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী

ফিরিতে ফিরিতে, থিয়েটারেরই বক্তৃতা করিতে করিতে চলিয়াছে—"বঙ্গের বধূ! তুমি মনটাকে কর লোহার সিন্ধুকের মত, আর বুকটাকে কর শীলের মত। মনের বাহিরে শত অত্যাচার হউক—ভিতরের কিছু প্রকাশ করিও না। বুকের উপর পাহাড় গুঁড়া হইয়া যাউক—কথা বলিও না।" ইত্যাদি। আর একজন গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে—"সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়—।"

বীরেশ্বরও গুণ-গুণ করিয়া গায়িতে গায়িতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল—"সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়—"

লেখিকা।

প্রথম ভাগ।

দরিদ্রকে অযাচিতভাবে আশাতীত দান করিলে সে যেমন সন্দিগ্ধচিত্তে দাতার মুখের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ও ভাবে—এ বুঝি একটা রহস্য একটা কৌতুক—নব্য মেজাজী ভগ্নীপতির পত্র পাঠে প্রিয়ঙ্কর বাবুও সেইরূপ অসম্ভব সন্দিহান দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন! এতকাল পরে যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী পরিত্যক্তা গিরিবালার অদৃষ্টের গতি ফিরিল; তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থান কলিকাতার বাসাবাটীতে লইয়া যাইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এ যেন তাঁহার নিকট মস্ত একটা অযাচিত অনুগ্রহের দান বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

নিশীথ পিতার একমাত্র পুত্র। গ্রাম্য ইংরাজি স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত সেই সময় তাহার পিতামাতা উভয়েই ইহ সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পরপারে চলিয়া যান। নিশীথের পিতা গিরিবালাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বৈবাহিককে গৌরীদানের পুণ্যলাভের অবসর দিয়া, নিজেও কিছু পুণ্য সঞ্চয়

করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। নিশীথের আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। পৈতৃক ভিটা মাটি শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিবন্ধুরা মিথ্যা মোকদ্দমার সাহায্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া হতভাগ্য নিশীথকে পথে দাঁড়াইবার সুপ্রশস্ত পথ করিয়া দিলেন। কলিকাতার 'মেস্' বা 'মোসাফির-খানা' ভিন্ন তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়াইয়া সে বি-এ পাশ করিল। বলা বাহুল্য কলিকাতার 'আব-হাওয়া' তাহার যাদুমন্ত্রের ছাঁচে ফেলিয়া, নিশীথকে ঠিক আদর্শ নব্যবাবু বা সাহেব অথবা Mr. Mukerjee—এইরূপ ধরণের একটা কিছু করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

ছেলে পড়াইয়াই নিশীথ এম্-এ পাশ করিল। এতদিন একটানা সোজা পথে চলিয়া, এক্ষণে সম্মুখে আঁকাবাঁকা পথ দেখিয়া নিশীথ থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সহায়সম্বলহীন যুবকের পক্ষে সে আশা পূরণের ক্ষমতা কই? কি লক্ষ্য করিয়া যে সে চলিয়া যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা কিছুদিন সে হ্যাটকোট পরিয়া বন্ধুগণের টী-পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

নিশীথ বুঝিয়াছিল—কি ব্যর্থ তাহার জীবন! এই বন্ধুবর্গের স্ত্রীগণ—কিরণ রায়, স্নেহ বোস, ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের এক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা। আর

গিরিবালা!, পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ নিভৃত পল্লীর অনক্ষরা অসভ্যা ক'নে-বৌ! সেত কোন দিনই নিশীথের মনে এতটুকু স্থান পায় নাই? কি অসামঞ্জস্য এই মিলন! কি ভাগ্যবান্—এই লেখিকা-গণের স্বামিবৃন্দ! 'ধিক্' নিশীথের বিদ্যায়!

নিশীথ সমস্ত মাসিক পত্রের ও পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। যখনই সে কিরণ রায়ের ছোট গল্প ও স্নেহ বোসের কবিতা পাঠ করিত, তখনই তাহার গিরিবালার উপর একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগিয়া উঠিত।

জীবনটাকে কি কোন নূতন পথে চালাইয়া পদ্যময় করা যায় না? নিশীথ অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা মস্ত আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যে দিন সে জানিতে পারিল যে, বহুদিন পূর্ব্বে তাহার এক পল্লী বালিকার পাণিপীড়নের কথা তাহার বন্ধুবর্গ সকলেই অবগত আছেন, সেইদিন হইতে নিশীথ বুঝিয়াছে,—তাহার জীবনের নূতন সাধ মিটিবার নহে। সঙ্গে সঙ্গে—"স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্বিবাহ নিষেধ"—সমাজের এই অন্যায় নিয়মের মূলচ্ছেদ না হওয়ার জন্য মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইল। কি নির্দ্দয় এই সমাজ!

বিদ্বান্ হইয়া কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। একরাত্রে কেহ লেখক বা লেখিকা হইতে পারে না। শিক্ষা চাই, সময় চাই। গিরিবালাকে কি নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিলে, সে এঁদের মত

হইতে পারে না ? অবশ্যই পারে। সেও ত মানুষ! কিন্তু কি বিশ্রী ঐ নামটা 'গিরিবালা'!

নিশীথ অনেক চেষ্টায় একটি কলেজের প্রফেসারী পদ সংগ্রহ করিল ও পৃথক্ একটি বাসার ব্যবস্থা করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিবালাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে মত জানাইয়া প্রিয়ঙ্কর বাবুকে পত্র লিখিল।

[২]

কিজন্য যে তোমাকে আমার কাছে এনেছি, তুমি বোধহয় তা বুঝতে পারনি।"

"স্বামী যখন নিজস্ত্রীকে কাছে নিয়ে আসে, তখন স্ত্রী একবারও বুঝবার চেষ্টা করে না যে সেই 'কাছে আনাটার' মধ্যে কোন 'কারণ' বা 'কেন' আছে কি না,—সেটা এতই স্বাভাবিক। তবে তুমি যে হঠাৎ আমাকে এতদিন পরে দয়া ক'রে কাছে ডেকেছ এটার মধ্যে বোধ হয় কিছু কারণ থাকতে পারে, তবুও সেটা আমার বুঝবার কোন আবশ্যক নেই। কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হোচ্ছে,—এসুখ বুঝি বা আমার অদৃষ্টে সহ্য হবে না।"—গিরিবালা বলিতে বলিতে মাথা নীচু করিল।

নিশীথ ক্ষণকাল নীরবে গিরিবালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া মনে মনে ভাবিল,—বাঃ! এ অনক্ষরা এত কথা শিখিল কোথায় ? তাহার পর উৎফুল্লস্বরে প্রকাশ্যে বলিল—"বাঃ

তোমার তো বেশ কথার বাঁধুনি! তুমি এত কথা কোথায় শিখেছ? লেখা পড়া কিছু শিখেছ কি?"

"কিছু না। বৌদি আমার খুব লেখা পড়া জানেন। তিনি আমাকে অনেক ভাল ভাল বই পড়িয়ে শুনিয়েছেন। আমাকে লেখা পড়া শেখাবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু আমি শিখিনি। তিনি বলেন—আমার খুব স্মরণ শক্তি আছে।"

নিশীথ সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল—হ্যাঁ, গিরিবালা সরলা বটে।

"তা বেশ। তবে শেখনি কেন? শিখ্‌তেই হবে। তোমাকে আমার কাছে আন্‌বার উদ্দেশ্যও তাই। এ‍‍বার চেষ্টা ক'রে দেখবো,—তুমি আমার যোগ্য হোতে পার কি না!"

"আমি যে তোমার যোগ্য হ'তে পার্‌ব, সে আশা ক'র্‌তে আমি সাহস করি না। তবে কি ক'রলে আমি তোমার যোগ্য হ'তে পারি, তুমি যদি তা দয়া ক'রে ব'লে দাও—আমি একবার প্রাণপণ ক'রে দেখতে পারি।"—জিজ্ঞাসুনয়নে গিরিবালা নিশীথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

"বেশ, তাই হবে। তবে প্রথমতঃ তোমাকে এক কাজ ক'র্‌তে হবে,—তোমার ও গিরিবালা নামটা ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। আজ থেকে তোমাকে আমি একটি নূতন নাম দেব।"

গিরিবালার মুখখানা যেন কেমন হইয়া গেল। সে মুখচ্ছবিতে প্রকাশ পাইল যেন অকস্মাৎ অনেকগুলি কথা একত্রে নিজ নিজ

স্থান অধিকার করিয়া লইবার জন্য গিরিবালার মনটাকে লইয়া কাড়াকাড়ি বাধাইয়া দিয়াছে। সে ভাবিতেছিল—'গিরিবালা'—এ যে আমার মায়ের দেওয়া নাম! মা মৃত্যুকালেও একবার ডাকিয়াছিলেন—'দুখিনী গিরিবালা—মা আমার!' সে মাত্র এই বছর খানেকের কথা। গিরিবালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। আর বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনটাও সেই ভাবনার আঁচে গলিয়া লাল ও তরল হইয়া গিয়াছিল,—তাই বুঝি তাহার মাথাটিও ধীরে ধীরে নোয়াইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে ধীর ও কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"তুমি যে নাম ধ'রে ডেকে সুখ পাও—তাই ব'লেই তুমি ডেকো।" গিরিবালা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

নিশীথ টেবলের উপর ঝুঁকিয়া, পেন্সিলের পিছনে কুঞ্চিত কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল—অরুণা করুণা, বেণু রেণু বাণী, রাণী;—কোন্‌টা? কোন্ নামটা পছন্দ করি? না এর একটাও মনে ধ'রছে না। আচ্ছা কলেজ থেকে এসে দেখা যাবে।

[৩]

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে আগুন লাগাইয়া নিঃশব্দে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। আর সেই আগুনের ঝলকা যেন সমস্ত কলিকাতায়ও আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলেজ হইতে বাসায় আসিতে নিশীথকে অনেকটা পথ ট্রামে

"আসিতে হয়। ট্রামগাড়ীতে বসিয়া নিশীথ ভাবিতেছিল,—দুনিয়ার ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'চ্ছি; আর স্ত্রীকে যদি শিক্ষাদানে নিজের সমান করে তুলে না নিতে পারলাম তবে আর আমার কিসের বিদ্যা? সমান স্তর কি? কিছু উচুই বরং। নিজের চেয়েও কিছু উচু করতে পারলে, তবেই আমার বিদ্যা, আমার শিক্ষা সব সার্থক হয়। ক'রতেই হবে। এই ঘোর জমায়েৎ সাহিত্যের হাটে তাকে যদি একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা ক'রে তৈয়ের করতে পারি, তবে সে গর্ব্ব আমার কত বড়! স্ত্রী আমার লেখিকা,—লেখিকার স্বামী আমি—এত নেহাৎ কম গৌরবের কথা নয়! আকাশ-কুসুম-বাবুর গর্ব্ব—কিরণ রায়। আর মলয়-বাবুর গর্ব্ব—স্নেহ বোস। স্ত্রী তাঁদের লেখিকা—এই গর্ব্বের ছায়ায় ব'সে, তাঁরা বুক ফুলিয়ে যেন ঘৃণার হাসিতে আমাকে উড়িয়ে দিতে চান। কেন না—আমার স্ত্রী পাড়াগেঁয়ে গিরিবালা। উঃ -বাবা কি ভুলটাই কোরে গেছেন! তবুও একবার প্রাণপণ ক'রে দেখব যে বনের ফুল এই সহরের মাটীতে ফোটে কিনা। আমার সমস্ত শিক্ষা তার শিকড়ের মূলে 'সারের' মত ঢেলে দিয়ে দেখবো—সেই ফুলের গন্ধে সহরের মানুষ মাতে কি না!

নিশীথ নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উৎসাহিত-কণ্ঠে ডাকিল—"কবিতা, কবিতা!"

গিরিবালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"ওকি ? তুমি ও কাকে ডাকছ ?"

নিশীথও মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমাকে। আজ থেকে তোমার ঐ নাম,—'শ্রীমতী কবিতাময়ী দেবী'। আজ সমস্ত দিনটা কলেজে বোসে শুধু তোমার নামই খুঁজেছি।"

"শেষে ওনাম কোথায় পেলে ?"

"কলেজের পর আসছি, দেখি কলেজের বাগানে একটা গোলাপ গাছের গোড়ায় কতকগুলো ঝরা শুকনো পাঁপড়ি ঢাকা ঐ ছোট্ট নামটি চাপা প'ড়ে আছে। আস্তে আস্তে তুলে বুক-পকেটে ক'রে এনে,—এই তোমায় দিলাম।"

নিশীথ তাহার কবিত্বময় কথার একটি সুন্দর জবাব পাইবার আশায় উৎফুল্ল দৃষ্টিতে গিরিবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু গিরিবালা নিশীথের কথার ভাব উপলব্ধির জন্য কোনরূপ আনন্দের বা নিরানন্দের চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, মাত্র ধীরে ছোট্ট একটি 'বেশ' বলিয়াই মস্তক নীচু করিল দেখিয়া নিশীথ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—হায়রে! কাকে কি ব'লছি! এ যে বেণাবনে মুক্তা ছড়ান!—তারপর একটা কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া একখানা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও অপর একখানা দ্বিতীয়ভাগ বাহির করিয়া গিরিবালার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"এই নাও, আজ থেকে সুরু কোরে দাও।

"ছমাসের মধ্যে শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন। রান্না বান্না চুলোয় যাক্। আমি ঠাকুরের ব্যবস্থা ক'চ্ছি।"

গিরিবালা প্রথম ভাগের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল —"ঠাকুরের রান্না আমি খাব না।"

বিস্মিত নিশীথ গিরিবালার নতমুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল "কেন?" ক্ষণকাল উভয়েই নীরব রহিল। নিশীথ ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের কোট খুলিতে খুলিতে দৃঢ় স্বরে বলিল—"দেখ, এখানে ওসব অন্ধ বিশ্বাস চলবে না। সব ঝেড়ে ফেলে দিতেই হবে। আজ না খাও—কাল তোমাকে খেতেই হবে। তুমি যে সেই রান্নাঘরের কালিমাখা কাপড়ে এসে দূর থেকে পৌরাণিক সুরে বোলবে—'তুমি আমার সর্ব্বস্ব'—তা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে আমি ঠাকুর চাকরের কাজ করবার জন্য এখানে আনিনি! যে জন্যে এনেছি তা ত তোমায় এতদিন ব'লেছি। যদি আমার যোগ্য হ'তে চাও, তবে শিক্ষায় আমার সমকক্ষ হ'তে হবে। বিদ্যার বিনিময়ে গর্ব্ব ও গৌরব কিনতে সহায় হতে হবে। এখন ভেবে দেখ তা পারবে কি না।" —নিশীথ কোটটাকে সজোরে বিছানায় নিক্ষেপ করিয়া জানালার দিকে মুখ ক'রিয়া নেকটাই খুলিতে লাগিল।

গিরিবালার বুকটার ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। কারণ কথাগুলি নিশীথ বড়ই দৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে বলিয়াছে। স্বামীর যোগ্য

হওয়া, স্বামীর কাজের সহায় হওয়া,—এযে বড়ই কঠিন কাজ। আমি সামান্য মেয়ে মানুষ, বিদ্যায় কি করে তাঁর সমান হব? এ যে অসাধ্য কাজ। বুঝি যায়;—গিরিবালার সব সাধ বুঝি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গুঁড়া হইয়া যায় গিরিবালার কান্না আসিতে লাগিল। সে ভীতস্বরে বলিল—"না না, তুমি রাগ ক'রোনা,— আমি আজ থেকে প'ড়বো।"

[৪]

একমাস পরে একদিন দ্বিপ্রহরে গিরিবালা খোলা জানালায় বসিয়া আছে। সম্মুখে কোলের কাছে, নিশীথ-প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাগের 'চক্র বক্রের' পাতা খোলা ছিল। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে পাশের গলিপথ দিয়া মাঝে মাঝে কাঁসর বাজাইয়া বাসন-বিক্রেতা যেন অনিচ্ছায় চলিয়া যাইতেছিল। আর যাইতেছিল—মাঝে মাঝে একটা উদাস করুণ সুরের হাঁক ছাড়িয়া—'ব্রোস্'। দূরে বড় রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে একটা লুঙ্গি পরা ছেলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে বিড়ি পাকাইতেছিল আর গাহিতেছিল—"আয়া কর, জ্যারা কয় দেও শ্যামলিয়া সে।" গিরিবালা ভাবিতেছিল,— কাছে এলাম কত আশা ক'রে। বৌদি ব'লতেন—রমণী-জীবনের সার্থকতা—স্বামিসেবায়। কিন্তু এ আমার কোন্ অদৃষ্ট? দিন রাত বই পড়। লেখা পড়া শিখে তাঁর সমান হ'তে হবে। নইলে তাঁর জীবনের আশা মিটবে না। কিন্তু আমি যে কি, আমাতে

'কি আছে, তাত' কই তিনি একবারও ভাবেন না! কোন্ ক্ষমতায় আমি তাঁর আশা মেটাব? বৌদিদিই ব'ল্‌তেন—সুখের জ্বালা ঠিক ফুলের কাঁটা। এ বুঝি আমার তাই।

গিরিবালার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া ক্রমে দুফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

মস্ মস্ জুতার শব্দ করিয়া নিশীথ কক্ষে প্রবেশ করিল। গিরিবালা শত সাবধানেও চক্ষুজল গোপন করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"আজ যে এত সকালে এলে? ওঃ আজ বুঝি শনিবার?"

নিশীথ গিরিবালার কথা যেন কিছুই শুনিতে পাইল না। অবাক্ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল গিরিবালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল— "ওকি! তুমি কাঁদছিলে কেন? কথা ব'লছ না যে?"

গিরিবালা মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া, ইংরাজি 'এন্' অক্ষরের নাকছবি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"আজকের পড়াটা বড় শক্ত।"

উপহাসের হাসি হাসিয়া নিশীথ বলিল—"এ হে-হে-হে! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলে-মানুষ। তা কাঁদছিলে কেন? আমার বেতের ভয়ে?"

গিরিবালা একবারের জন্য নিশীথের চোখে চোখ মিলাইয়া মৃদু হাসিল।

নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া নিশীথ গিরিবালার নিকট হইতে দ্বিতীয়ভাগখানা লইয়া বলিল—"দেখি কেমন শক্ত আজকের পড়া? আচ্ছা বানান কর দিকি—'পরাক্রম'?"

দক্ষিণহস্তে বামহস্তের অঙ্গুলি মর্দ্দন করিতে করিতে গিরিবালা বলিল—"ওখানটা আজ পড়িই নি।"

"সারা দুপুরটা তবে ক'ল্লে কি? আচ্ছা হাতের লেখা কই দেখি?"

একখানি বালির কাগজের লম্বা চওড়া খাতা বাহির করিয়া গিরিবালা নিশীথের সম্মুখে রাখিল। বিস্ফারিত নেত্রে খাতার লেখা দেখিতে দেখিতে নিশীথ বলিল—"বাঃ, হাতের লেখার পূর্ব্ব নমুনা ত নেহাৎ মন্দ মনে হ'চ্ছে না। তবে এই 'গণেশের' 'শয়ের' পুঁটুলি দুটো এত ছোট ক'রেছ কেন? আর একটু বড় হবে। তারপর এই 'পাইল'র 'পয়ে'র ঠ্যাংটা এত লম্বা হবে না। যাক্, লেখাটা মোটের উপর মন্দ হয়নি। তারপর পুরোণো—পড়া। আচ্ছা বানান কর দিকি—অসহ্য?"

গিরিবালা আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে বলিল—"অসহ্য? স্বরে-অ, দন্ত-স,—" তারপর যে কি, গিরিবালার কিছুতেই তাহা স্মরণ হইল না। সে একবার নিশীথের মুখের দিকে, একবার গৃহের আসবাব পত্রের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে চাহিতে বলিল—"তোমার মুখখানা অত শুকিয়ে গ্যাছে কেন?"

"রোদ্দুরে এসেছি—সেই জন্যে। তুমি বল—বল—অ-স-হ্য!"

"হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসো না?"

"দোবো-খন। তুমি বল, বল!"

গিরিবালার বুক কাঁপিতে লাগিল। কারণ সে জানে—পড়া বলিতে না পারিলে নিশীথ নীরব অভিমানে দুই একদিন কাটাইয়া দেয়। গিরিবালা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোন জবাব পায় না। গিরিবালার বুকে সেটা বেত্রাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশী বাজে। তাই সে কয়েক দিন সে কাঁদিয়া কাটাইয়া দেয়।

গিরিবালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে ইয়াররীংয়ের উপরিস্থিত—কয়েক গাছা অশান্ত চুলকে তাহাদের স্বস্থানে পাঠাইয়া দিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল—"আর ঝ এ য-ফলা।"

ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশীথও অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—"তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু!"

ছন্ করিয়া গায়ের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া—গিরিবালার চোখের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"স্মরণ-শক্তি আছে, না ছাই আছে। কাল প'ড়েছ, আর আজ তা হজম ক'রে ব'সে আছ। যাও—এক্ষুণি এই পড়া ক'রে দাও। যদি একটা ভুল যায় তবে,—"

তবে কি হবে শুনিবার জন্য গিরিবালা তাহার ছল ছল চক্ষু দুইটি তুলিয়া নিশীথের দিকে চাহিল। নিশীথ দৃঢ়স্বরে—"তবে

ভাল হবে না” বলিয়া বইখানাকে সজোরে গিরিবালার পায়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

গিরিবালা বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু তাহার অবাধ্য চোখের জল তাহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। বইখানাকে তুলিয়া লইয়া, টেব্‌-লের নিকট গিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে হেট মাথায় বসিয়া পড়িল।

—ভাল হবে না। সত্যই আমার ভাল হবে না। লেখাপড়া শিখ্‌তে না পার্‌লে যে আমার খুব মন্দ হবে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু আমি আর কি করি? আমার সে ক্ষমতা কই? বউদি! কেন ম’র্‌তে তোমার কথা শুনিনি!—ঝর ঝর করিয়া চোখের জল গড়াইয়া গিরিবালার সম্মুখস্থ উন্মুক্ত পুস্তকে গিয়া পড়িল। দ্বিতীয়ভাগের নির্দ্দয় শক্ত বানানগুলা গিরিবালার উষ্ণ অশ্রুসিক্ত হইয়াও, কোন মতে সহজ সরল হইল না। উপরন্তু—ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য—সমস্তই যেন তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে কালির পোঁচে একাকার হইয়া গিয়াছিল।

নিশীথ ভাবিতেছিল—নাঃ, আমার বৃথা চেষ্টা। কিন্তু কি ক’রে আমার আকাঙ্ক্ষা মেটাই! ওঃ—আজ যদি আমি single থাক্‌-তাম। কিন্তু এক ধাক্কায় পিছিয়ে পড়াটাও পুরুষের কাজ নয়। অনেক সামলাতে হবে। রবার্টব্রুস্‌ সাতবারের বার যুদ্ধে জয়ী

হ'য়েছিলেন। অধ্যবসায়ের এ একটি অকাট্য প্রমাণ। নিশীথ উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—"কবিতা, এখানে এস।"

গিরিবালা নিশীথের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নিশীথ তাহার দক্ষিণহস্ত ধরিয়া বলিল—"দেখ, লেখাপড়া বড়ই কঠিন কাজ, অন্ততঃ তোমার পক্ষে, তা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু, এতে অবহেলা ক'র্লে কিছুই হবে না। আর এর জন্য যদি সময় অসময়ে কটু-কথা বলি—তার জন্য রাগ ক'রো না। যেমন কটুকথা বলি, তেমনি মিষ্ট কথাও ত বলি। বস এইখানে, মন দিয়ে পড়।"

গিরিবালা নিশীথের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—যখন মিষ্টিকথা বল—তখন তাহার মিষ্টতা বড়ই বেশী। আবার যখন কটুকথা বল—তখন তাহার আঘাত বড়ই দারুণ। মোটের উপর এই মিষ্ট কটুর আধিক্যের কৈফিয়ৎ কেটে দেখতে গেলে, হাত মজুতে কটুর ব্যাথাটাই বড় বেশী বাকি থাকে। আর সেটা হাত-মজুত নয়,—তাই বুকের মজুত।

শিক্ষকের কঠিন শাসনাধীন ছাত্রের মতই গিরিবালা নিশীথের নিকট দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ভাগ।

(১)

তাহার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় প্রতিমাসেই সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র ও পত্রি-

কায় 'কবিতাময়ী দেবীর' কবিতা, ছোট গল্প অথবা প্রবন্ধে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। পাঠক-পাঠিকা কবিতাময়ীর লেখা পড়িবার জন্য আকুল আগ্রহে মাসকাবারের অপেক্ষা করে। চারিদিকে কবিতাময়ীয় লেখার ভূরি ভূরি প্রশংসা; পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সমালোচনা। সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আগ্রহ উদ্বেগ—এ কবিতাময়ী লোকটি কে, যাঁহার লেখা আজ আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আকাশ-কুসুম-বাবুর বাড়ীর টী-পার্টিতে মলয়বাবু, স্নেহ বোস, সুনীলবাবু, আমাদের নিশীথ ইত্যাদি আরও অনেক সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক, বে-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আকাশ-কুসুম-বাবু ও কিরণ রায় যে উপস্থিত ছিলেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

মলয়বাবু প্লেটে চা ঢালিতে ঢালিতে নিশীথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা নিশীথবাবু! কবিতাময়ীর লেখা আপনার কেমন লাগে?"

নিশীথ একটু গম্ভীর সুরেই বলিল—"নেহাৎ মন্দ নয়।"

আকাশ-কুসুম-বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন তৎপূর্ব্বেই কিরণ রায় বলিলেন up-to-date লেখায় কবিতাময়ীর লেখাকেই—সাহিত্যিকগণ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। বাস্তবিক তা দেওয়াও উচিত। আহা কি মধুর! আপনারা বোধ হয় প'ড়েছেন—এ

মাসের 'প্রভাতী'তে বেরিয়েছে তাঁর একটি কবিতা—'দয়িত।' অতি মধুর।" কিরণ রায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া স্নেহবোস বলিলেন—"আর 'বিজলীতে' বেরিয়েছে গল্প 'পথহারা।' যেমন plot তেমনি ভাষা।"

কবিতাময়ীর লেখার প্রশংসা শ্রবণে গর্ব্বে ও শ্লাঘায় নিশীথের যে বেশ একটু ভাবান্তর হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখের মৃদুহাসি, ঈষৎ চাঞ্চল্যভাব, সমস্তই যেন বাঙ্গালার নাট্যশালার অভিনেতার বাহবা-বর্জ্জিত প্রাণহীন হাব-ভাবের মতই জ্ঞান হইতেছিল।

নিশীথের পার্শ্বোপবিষ্ট সুনীলবাবু নিশীথের দিকে একটু ঝুঁকিয়া টেবিলস্থিত অ্যাশ্‌ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন,—"আচ্ছা নিশীথবাবু! কবিতাময়ী লোকটিকে আপনি জানেন?"

সুনীলবাবু প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক নয়নে নিশীথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিশীথ এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"আমার এক নিকট আত্মীয়া।"

সকলেই বিস্ময়-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"বলেন কি? কই—এতদিন ত বলেননি! আপনার কে বলুন?" নিশীথকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

অনেক অনুরোধের পর যখন নিশীথ জানাইল যে, তাহারই স্ত্রী,—তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়নির্ব্বাকে সেস্থান নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শেষে চতুর্দ্দিকের ঘন ঘন করমর্দ্দনে নিশীথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার সৌভাগ্যের স্তুতি-গানে হলঘর মুখরিত হইয়া উঠিল। কিরণ রায় ও স্নেহবোস হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এ সংবাদ এতদিন তাঁহাদের না জানান নিশীথের বড়ই অন্যায় হইয়াছে। একজন দেশমান্য লেখিকা তাঁহাদের এত কাছে থাকা সত্বেও এত-দিন দর্শনলাভ না হওয়াটা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের সে আশা মিটাইয়া—নিজেদের ধন্য মনে করিবেন।

তদুত্তরে নিশীথ ভদ্রতার খাতরেও কোন কথা বলিল না। কি জন্য কে জানে—তাহার বুকের স্পন্দন তখন অস্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২)

"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আপনি যদি অনুমতি দেন,—তবে তাঁরও কোন আপত্তি থাকবে না। নিশ্চয়ই তিনি রাজি হবেন।" কিরণ রায় ও স্নেহ বোস নিশীথের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় বলিলেন "দেখুন আর সময়ও ত নেই!"

"আপনারা দিন স্থির ক'রেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ,—এই ২৩শে এপ্রিল—"

নিশীথ কি চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ! এত তাঁর পক্ষে গৌরবের বিষয়। এতে আমার আপত্তি থাকবার কোনই কারণ নাই!"

"তবে আমরা বিজ্ঞাপন দিতে পারি?"

"হাঁ—তা—তা দিতে পারেন বৈ কি!"

কিরণ রায় ও স্নেহবোস সন্তুষ্টচিত্তে নিশীথকে বিদায় দিলেন।

পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল—"আগামী ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় মহিলাপার্কে মহিলাগণের একটি সভার অধিবেশন হইবে। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী কবিতাময়ী দেবী অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সাধারণ মহিলাগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।"

(৪)

"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর। তা আমি কিছুতেই পারব না। ঘরে বসে তোমার সব কথা শুনব, কিন্তু জুতো মোজা পায়ে দিয়ে সং-সেজে আমি বাইরে বেরোতে পারব না। এ অন্যায় অনুরোধ ক'রো না।"—কাতর নয়নে গিরিবালা নিশীথের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিশীথ মিনতির স্বরে বলিল—"শুধু 'আজকের দিন। আর কখনও তোমায় এ অনুরোধ ক'রব না। আজকের কাজটা যদি

সেরে আস্‌তে পার, তবে সমস্ত বাঙ্গলাময় নাম ছড়িয়ে প'ড়বে। বল দিকি—সেটা কি কম গৌরবের কথা? শুধু আজকের জন্যই ১৪৲ চোদ্দ টাকা খরচ ক'রে তোমার জন্য জুতো এনেছি আজকের দিনটা পায় দাও,—আর কখনও ব'লব না। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সভায় যাবে তাতে আর লজ্জা কি? তুমি আজকের সভায় সভাপতি হবে ব'লে তাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন,—না যাওয়াটা বড়ই অন্যায় হবে। তাঁদের অপমান করা হবে। তাঁদের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।''

"আমি যদি এ সভায় যাই, তবে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে?''

"খুব উজ্জ্বল হবে। তা আজ তোমায় বোঝাতে পারব না। কাল যখন খবরের কাগজে এই সভার বিস্তারিত বিবরণ বেরোবে, তখন দেখবে,—তার প্রত্যেক লাইনে লাইনে, প্রতি কথায় কথায় আমাদেরই কতখানি গর্ব্ব মাখান আছে। নাও, আর দেরি কোরো না। প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। এখনই আমার বন্ধুর স্ত্রী কিরণ রায় তোমায় নিতে আস্‌বেন।"

গিরিবালা মনে মনে ভাবিল—না, আমি কিছুতেই যাব না। স্বামী হ'য়ে নিজ স্ত্রীকে সভায় পাঠিয়ে দেওয়া—এ আবার কোন্ খেয়াল? কিন্তু, আমি গেলে—দশের কাছে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হবে। প্রকাশ্যে বলিল—"আমি জুতো কিছুতেই পায়ে দেবো না।

আর তুমি যদি যাও, তবেই আমি যেতে রাজি আছি। নইলে—"

ঠিক সেই সময় বাসার দরজার একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। নিশীথ ব্যস্ততাসহকারে বলিল—"নাও—নাও আর পাগ্‌লামো কোরো না। ঐ তোমায় নিতে এসেছেন।"

(৪)

ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে। অত্যন্ত অবাধ্য। কিচুতেই জুতো পায়ে দিলে না? এর চেয়ে যে না যাওয়াই ভাল ছিল! তারপর গেল কিনা—একখানা মোটা শাড়ি প'রে? আর গায়ে জড়িয়ে গেল—একখানা বোম্বাই চট্? আরে ছ্যাঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সেই পোষাকে যখন সভায় গিয়ে বোসবে, তখন বক্তৃতার পূর্ব্বেই যে সেখানে বেজায় রকম ক্ল্যাপ প'ড়ে যাবে!—নিশীথ ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িল। একাকী বাসায় সময় অতিবাহিত করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। সে হেদোর ধারে গিয়া পায়চারি করিতে করিতে আবার ভাবিতে লাগিল,—কিন্তু আসল কাজটা যদি কোন রকমে উদ্ধার ক'রে আসতে পারে—তবেই—সব মানিয়ে যাবে। এইত সাড়ে ছয়টা বাজে। এখনই হয়ত কবিতা সেই প্রবন্ধটা ব'লছে,—আর ঘন ঘন হাততালি প'ড়ছে। হুঁ, এইবার আকাশ-কুসুমবাবু আর মলয়বাবু, তোমাদের দেখাব, যে আমার গর্ব্ব—তোমাদের

চেয়ে ছোট—কি বড়! নিশীথের মনটা একবার মুচ্‌কি হাসিল।

কতক্ষণে কবিতা বাসায় ফিরিয়া আইসে, তাহার নিকট সভার সংবাদ জানিবার জন্য কৌতুকে নিশীথের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শিশ্‌ দিয়া একটা ইংরাজি গৎ বাজাইতে বাজাইতে নিশীথ বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। একি? কবিতা বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছ কেন? নিশীথ ক্ষিপ্রহস্তে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিরিবালার নিকট গিয়া বসিয়া জলদ-ভাষায় বলিল—"একি? তুমি চলে এসেছ? সভা এত শীঘ্র হ'য়ে গেল? তারপর সভার খবর কি? প্রবন্ধটা বেশ ব'লতে পেরেছ?"

গিরিবালা উঠিয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"যাও, আমি তোমায় কিছু ব'লব না।"

কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় নিশীথের বুকটার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কেন, কি হ'য়েছে ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছ কেন?"

"কাঁদব না? আমার ডাকছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। এমনি কোরে লজ্জা দেবার জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে সভায় পাঠিয়েছিলে?"

"কেন, লজ্জা কিসের? স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সভায় যাবে তাতে আর—"

গিরিবালা যেন ঠিক দুই হাতে নিশীথের মুখ চাপিয়া তাহার কথায় বাধাদিয়া বলিল—"হ'লেই বা স্ত্রীলোক। ওদের কি? ওরাত খৃষ্টান।"

নিশীথ হাসিবে কি কাঁদিবে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিল যে সভায় এমন একটা হইয়াছে, যাহাতে তাহার বন্ধুমহলে মুখ দেখান ভার হইবে। তথাপি সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওরা খৃষ্টান কি ক'রে বুঝলে?"

"না, খৃষ্টান না! পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ইংরিজিতে কথা বলে।"

নিশীথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"যাও—তুমি হেসো না।" গিরিবালা অস্বাভাবিক রকম ঘোমটা টানিয়া দিল।

"তা বেশ ওরা খৃষ্টান। এখন তুমি, সভায় কি ক'রে এলে বল দিকি? প্রবন্ধটা ব'লেছিলে?"

"আমি কিছু বলিনি। তুমি আমায় আর বিরক্ত কোরো না। আমার ভাল লাগছে না।" গিরিবালা মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও গিরিবালা আর কোন কথা বলিল

না। নিশীথের বড়ই বিরক্তবোধ হইতে লাগিল। বিরক্তি শেষ পর্য্যন্ত ক্রোধে পরিণত হইল।

সে রাত্রি উদ্বেগে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে, সভার সংবাদ জানিবার জন্য নিশীথ আশ-কুসুমবাবুর বাড়ী যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইল। কিন্তু, কিসের লজ্জা, কি একটা সঙ্কোচ তাহাকে নিরস্ত করিল। বৈকালে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া পড়িল।

হেদোর ধারে মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মাথায় ট্রাম দাঁড়াইবা মাত্র খবরের কাগজ-বিক্রেতারা হাঁকিল—"মহিলা পার্কে বিরাট সভা কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী। নিশীথবাবুর নূতন নেশা। পুলিন বাবু —বসুমতী, নায়েক!" একজন কাগজওয়ালা একখানা কাগজ নিশীথের সম্মুখে ধরিল।

কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী? কি সর্ব্বনাশ! নিশীথের রক্ত হিম—অসাড় হইয়া গেল। একখানা কাগজ লইয়া তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিয়া গিয়া ফুটপাথের রেলিং হেলান দিয়া রুদ্ধশ্বাসে পড়িতে আরম্ভ করিল। একি লজ্জা! নিশীথের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পায়ের তলায় পৃথিবী বুঝি বা সরিয়া গিয়া তাহাকে ডুনিয়ার ব্যঙ্গ চাহনির সম্মুখে, বিশ্বের বিদ্রূপের ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দেয়! নিশীথ তাহার কম্পিত দেহটাকে রেলিংয়ের গায়ে চাপিয়া ধরিল। একি ঘৃণা। জগতের চক্ষু যেন

তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছে! মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা যেন তাহারই কথা লইয়া মহা সোরগোল জমাইয়া দিয়াছে। আর তাহাদের উপহাসের তাচ্ছিল্য নিদর্শন—বিষ্ঠা-বিন্দু আসিয়া টপ্ করিয়া নিশীথের হস্তস্থিত কাগজে পড়িল। নিশীথ দ্রুতপদে গিয়া বাসায় প্রবেশ করিল।

গত কল্য হইতে গিরিবালা রাগে অভিমানে নিশীথের সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই। এক্ষণে যে মূর্ত্তিতে নিশীথ গৃহে প্রবেশ করিল, তদ্দর্শনে গিরিবালার রাগ অভিমান কোথায় সরিয়া গেল। সে বেশ বুঝিল—এবার যে আগুন জ্বলিবে, তাহা দূরস্থ আলেয়ার আগুন নহে। সে আগুনের আঁচ তাহাকে সত্য সত্যই ঝলসিয়া মারিবে। ইচ্ছা সত্ত্বেও সে কোন কথা বলিল না। তবে তাহার অভিমানের মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নহে। আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

কাগজখানাকে সজোরে গিরিবালার গায়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া নিশীথ বজ্র-কঠোর-কণ্ঠে বলিল—"কাগজভরা সুখ্যাতি! খুব নাম কিনে এসেছ কাল! বাঃ—খুব মুখ উজ্জ্বল ক'রেছ আমার! পড়—ঐ জায়গাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়।" ক্রোধে নিশীথ কি করিবে বুঝিতে পারিল না। জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কেন, কেন? কি হ'য়েছে? আমি কি ক'রেছি?"—কম্পিত

হস্তে কাগজখানা লইয়া গিরিবালা পড়িতে লাগিল—"গত কল্য মহিলা-পার্কে মহিলাগণের একটি সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ফলে,—একটি শিক্ষিত যুবকের—আজগুবি আকাঙ্ক্ষা, বিদঘুটে বাতিক ও নূতন ধরণের নেশার কথা প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত সভায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী কবিতাময়ী দেবী—সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। সভাস্থলে অসংখ্য মহিলার শুভাগমন হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতী কিরণরায়ের সহিত শ্রীমতী কবিতাময়ী সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে মহিলাবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাহারও সহিত বাক্য বিনিময় করা দূরের কথা, কদলী-বধূর ন্যায় হস্তপরিমিত অবগুণ্ঠন টানিয়া নত মস্তকে কবিতাময়ী কিরণরায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে সমগ্র মহিলামণ্ডলী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াও তিনি পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলের নিতান্ত অনুরোধেও আসন গ্রহণ করিলেন না। একজন শিক্ষিতা মহিলার এই অস্বাভাবিক সঙ্কোচ দর্শনে সকলে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে কবিতাময়ী অধিকতর

জোনাকির আলো।

'সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ও কিরণরায়ের কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—'আমি সভা টভার কিছুই জানি না। তোমাদের পায়ে পড়ি—আমায় বাসায় রেখে এস।' শত অনুরোধেও তিনি সেস্থানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা কিরণরায় তাঁহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দেন। বাসায় ফিরিবার সময় কিরণরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিনি এরূপ করিলেন কেন! তাঁর মুখে দুইটা কথা শুনিবার জন্য এতগুলি ভদ্রমহিলা কতখানি আশা লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন—তিনি ওসব কিছুই জানেন না। তিনি খুব সামান্যই লেখাপড়া জানেন। এতদিন তাঁর নামে যে সমস্ত গল্প কবিতাদি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সমস্তই তাঁর স্বামী নিশীথবাবুর নিজের লেখা। ইহাই গত কল্যকার সভার বিবরণ।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই,—নিশীথবাবুর এ কোন্ দেশী নেশা? নিজের নামটাকে ছাপাইয়া দিয়া, স্ত্রীর নামটা সধারণে প্রকাশ করিবার এত বাতিক কেন? পালক গুঁজিয়া ময়ূর হইবার এতসাধ কেন হে বাপু—যাহা হউক, আমাদের শেষ বক্তব্য এই,—নিশীথবাবুর এতদিন সাহিত্যসমাজে স্ত্রীর নাম দিয়া বাঙ্গালার পাঠক পাঠিকাগণকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহার

কোন কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আশা করি সাহিত্যরথিগণ এ বিচারের ভার গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

গিরিবালার কাগজ পড়া শেষ হইল, কিন্তু সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। হেঁটমাথায়, নখাগ্রে মেঝের উপর নিরাকার 'ক খ' লিখিয়া তাহার উপর ঘন ঘন দাগা বুগাইতে লাগিল।

"কি? চুপ ক'রে রইলে যে? সব মিছে কথা লিখেছে,—না?"—নিশীথের কর্কশকণ্ঠে গিরিবালা চমকিয়া চাহিয়া পুনরায় মাথা নীচু করিয়া বলিল—"না—মিছে কেন লিখবে—ঠিকই লিখেছে।"

"বটে! ঠিকই লিখেছে! ব'লতে মুখে একটু বাধ্‌ল না? দশের কাছে আমার মাথা হেট্‌ করালে? শেষে কিনা—সব প্রকাশ ক'রে এলে?" তীব্রদৃষ্টিতে নিশীথ গিরিবালার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চাহনি গিরিবালা সহ্য করিতে পারিল না।

"আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে তাই বোল্লাম। এতে আর আমার দোষ কি?"

"নাঃ কিছু না। যত দোষ আমারই। তা বেশ ক'রেছ। এখন তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থাক। যখনই ব'ল্‌ব, তখনই আমার ঘর-খালি ক'রে দিতে হবে। তোমার দাদাকে আমি টেলিগ্রাম ক'রতে চ'লাম।"

দ্রুতপদে সোপান বাহিয়া নিশীথ নামিয়া গেল। ফিরিবার

অনুরোধ করিতেও গিরিবালা অবসর পাইল না। খোলা জানালা দিয়া নিশীথের গন্তব্য গলিপথের দিকে চাহিয়া দেখিল—নিশীথ চলিয়া গেল। দুই হাতে বুক চাপিয়া গিরিবালা সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা তাহার আঁধার আঁচল নিঃশব্দে সহরের গায়ে বিছাইয়া দিল। আর মানুষ তাহাতে গ্যাস্ বিজলীর বাতি জ্বালিয়া উজ্জ্বল বুটী বসাইয়া দিল। জানালার গরাদের গায়ে মাথা রাখিয়া গিরিবালা অবিশ্রান্ত চোখের জল মুছিতে লাগিল। অদূরে মুখ-পোড়া কাগজওয়ালারা তখনও হাঁকিতেছিল—"কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী।"

অভিমানে।

সে বৎসর বসন্তরোগ এদেশটাকে সম্পূর্ণরূপে নিজ অধিকারে লইয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল—বিশেষতঃ, কলিকাতাই তাহার প্রধান রঙ্গভূমি—ঠিক সেই সময় বসন্তকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে কলিকাতা গেল। তার মা-বাপ বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ভাবিয়া অস্থির। ছেলে'ত গেলেন পরীক্ষা দিতে,—কলিকাতায় যে বসন্ত হইতেছে—কি আছে কপালে কে জানে!

বসন্তকুমার পরীক্ষান্তে বসন্তরোগের হাত এড়াইয়া যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছিল। ছেলে নিরাপদে পরীক্ষা শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে—মা বাপ আহ্লাদে আটখানা। বসন্ত মনে মনে স্থির করিল,—অনেক দিন পরে দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, এই অবসরে একবার পশ্চিম ভ্রমণে যাইতে হইবে। কিন্তু বসন্তের সে আশা মনেই জমা থাকিল। একদিন প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া সে শয্যা লইল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগ দেখা দিল। বাড়ীতে একটা অশান্তি ও চিন্তা আসিয়া সকলকে ঘেরিয়া বসিল। বসন্তের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বাড়ীর সকলে নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল। একদিন এক আত্মীয়া বসন্তকে দেখিতে আসিয়া, তাহার মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—"তা মা, ও মা-শেতলার দয়া হ'য়েছে, তিনিই আবার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দেবেন, সব জুড়িয়ে যাবে।" তিনি বিদায় লইবার কালীন উপসংহার করিলেন—"দেখ দেখি, সোণার চাঁদ ছেলে,—আজ বাদে কাল একটা পাশ দেবে,—তার কপালে এত কষ্ট!" বসন্তের মাতা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"মা! পাশ এখন মাথায় থাক, ছেলের প্রাণ পেলে বাঁচি।" বসন্ত, রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে, যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক চাহনিতে একবার মায়ের প্রতি চাহিল ও মনে মনে ভাবিল—মা বল্লে কি না,—পাশ এখন মাথায় থাক,—ছেলের প্রাণ পেলে বাঁচি। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা কে জানে! বসন্তকুমার সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

তখনও বসন্তের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, একাকী বাহির বাটীতে বসিয়া ভাবিতেছে—কোন্ কলেজে পড়িব। এমন সময় একটী প্রতিবাসী বালক আসিয়া আনন্দবিজড়িত কণ্ঠে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বসন' দা! আপনাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে।" বসন্ত ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বল্লে?" বালক জানাইল—"বেঙ্গলিতে বাহির হইয়াছে, সকলে আপনার নাম

খুঁজিতেছে।” বসন্তের দুর্ব্বল শরীর কাঁপিয়া উঠিল। চলিবার শক্তি নাই। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—‘কি হইয়াছে কে জানে’—হয়ত কেহ খপর লইয়া আসিতেছে—এই আশায় পথ চাহিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তবুও কেহ কোন সংবাদ আনিল না। বসন্ত স্থির জানিল যে—সে ফেল্ হইয়াছে। তথাপি মানবপ্রকৃতির বশে আশা ছাড়িয়াও আশাকে অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারিল না। ঘোর সন্ধ্যার গা-ঢাকা অন্ধকারে যখন বসন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ তাহার নীরব চিন্তার গভীরতা ভগ্ন করিয়া বাহির বাটীর প্রাঙ্গণ দিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে যাইতেছিল, তখন বসন্ত ভীত কম্পিত স্বরে ডাকিল—“শরৎ!” —অপহৃত দ্রব্যসহ হাতে হাতে ধরা পড়িলে চোরের যেরূপ অবস্থা হয়, শরতের অবস্থাও ঠিক যেন তদ্রূপ হইল। সে ভাবিয়াছিল, সে রাত্রিকার মত দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না; কিন্তু ‘অন্ধের পা খালেই পড়ার’—মত দাদার সহিত তার প্রথম সাক্ষাৎ হইল! সে কি বলিবে কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, যাহা সে দাদার নিকট প্রকাশ করিবে না বলিয়া এতক্ষণ মনে মনে স্থির করিয়া আসিতেছে,—সেই কথাই বলিয়া ফেলিল—“দাদা! আমাদের স্কুল হইতে মোট তিনজন পাশ হইয়াছে।” বসন্ত উৎসাহিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কে কে!”—এইবার শরৎ বড়ই বিপদে পড়িল, চিন্তার সময় নাই, বলিতেই হইবে—হয়

আজ,—নয় কাল। শরৎ নতমুখে বলিল—"অনিল, অমূল্য" আর একটী মাত্র নাম অবশিষ্ট, তখনও বসন্ত আশা ছাড়িতে পারে নাই। তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল,—শরৎ বলিল—"আর ননীগোপাল।" তারপর—যেন একটা দম্‌কা হওয়ায় প্রদীপ নিভিয়া গেল। বসন্ত চোখে আঁধার দেখিতে লাগিল। হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। উভয়েই নীরব। শরৎ অন্ধকারে দাদার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কিছুই দেখিতে পাইল না। সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। তারপর—বসন্ত ভাবিল —এ কি হইল? এত দিনের উদ্যম, চেষ্টা এক কথায় মিটিয়া গেল! আমার অসুখ হইলে মা একদিন বলিয়াছিলেন—"পাশ এখন মাথায় থাক, ছেলের প্রাণ পেলে বাঁচি,—" শেষে ঠিক তাহাই হইল! কিন্তু এ বড় লজ্জা। মা শুনিতে পাইলে বিশেষ দুঃখিত হইবেন, আর বাবা বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করিবেন।

ক্রমে, পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্যতার সংবাদ পরিবারবর্গের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িতা হইয়া এ কথাটী না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না—যে,—"আমাদের তেমনি অদৃষ্ট কি না, যে ছেলে লেখা পড়া শিখে আমাদের সুখী ক'রবে!" পিতাও বলিতে ছাড়িলেন না—"আমি জানি ওটা কোনও দিন পাশ কোর্ত্তে পারবে না" কথাগুলি বসন্তের কাণে পৌঁছিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে বসন্ত মৃতপ্রায় হইল।

পিতামাতা পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু, বসন্ত নীরব রহিল। পিতামাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসন্ত চাকুরির চেষ্টায় বিদেশ যাত্রা করিল। যাত্রাকালীন মাতার পদধূলি লইতে গিয়া বসন্ত মাতার চক্ষে জল দেখিয়া,—কি যেন বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না,—পাছে রুদ্ধ বেদনার দারুণ আঘাতে তাহারও চক্ষে জল আইসে। সে তাড়াতাড়ি ব্যাগটী লইয়া দ্রুত-পদে বাহির হইয়া পড়িল। মাতা বুঝিলেন—ছেলের অভিমান হইয়াছে,—পুত্র জানিল মাতার দুঃখ হইয়াছে।

প্লাটফর্ম্মে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। বসন্ত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ধীরে ধীরে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল। বসন্তের ছলছল চোখের উদাস চাহনির প্রতি কেহই লক্ষ্য করিল না। বাল্য জীবনের সমস্ত কথাগুলি বসন্তের মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। মায়ের আদর, পিতার স্নেহ, ভ্রাতাভগ্নীর ও বাল্যবন্ধু-গণের অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন কি বাড়ীর পালিত কুকুরটীর কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইল। তার পর মনে পড়িল—পাঠগৃহের দেওয়ালগাত্রের বীণাপাণির প্রতিচ্ছবির কথা। সে একবার মনে মনে বলিল—"মা সরস্বতি! ক'র্লি কি? তোকে না আমি বাল্যকাল হইতে প্রতি প্রাতে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে যুক্ত-করে বলিয়া আসিতেছিলাম, "মা আমায় বিদ্যা দে মা!" তার, বুঝি এই আশীর্ব্বাদ?"—এইরূপ বাল্যজীবনের প্রতি ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি বসন্ত মনের মধ্যে একবার আঁকিয়া লইয়া চোখের জলে সমস্ত মুছিয়া ফেলিল। তারপর বাল্যজীবনের অস্পষ্ট স্মৃতি বুকে করিয়া পঞ্চদশ বৎসরের বালক বসন্ত, জীবনের প্রথম, বিদেশে কোথায়-কোন্ অজানিত পথে চলিয়া গেল।

সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু বসন্ত ইহার মধ্যে একদিনের জন্যও বাড়ী আসিল না। মাতা একদিন অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীকে বলিলেন—"ছেলের আমার একি ভাব হ'ল? লোকের ছেলে কি ফেল হয় না? সবাই কি পাশ হয়?"

[২]

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গণে আসিয়া কে যেন ডাকিল,—"মা!" মাতা চমকিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বসন্ত আসিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিল। ঠিক সেই সময় বসন্তের নত-মস্তক হইতে দুই বিন্দু জল জননীর চরণ স্পর্শ করিল। মাতার মনে সন্দেহ জন্মিল—"একি পরিশ্রমজনিত স্বেদবিন্দু! না,—অভিমানের অশ্রুবিন্দু!" পুত্রের অকস্মাৎ আগমনে মাতা যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। সংবাদ না দিয়া হঠাৎ বাড়ী আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বসন্ত বলিল—"বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কলিকাতা আসিয়াছিলাম, অমনি একবার বাড়ীও আসিলাম।" একবৎসর

পরে বসন্ত বাড়ী আসিয়াছে, সকলেই তাহাকে নূতন একটী আদরের জিনিস বলিয়া মনে করিতে লাগিল। প্রবাসী পুত্র ঘরে আসিলে মায়ের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা পুত্রের মা ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে অক্ষম। কিন্তু বসন্তের মনে —কি জানি—কোন স্ফূর্ত্তি নাই। সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাব, ইহার কারণ কেহই সন্ধানে পাইল না। পুত্রের মুখ মলিন দেখিলে কোন্ মায়ের প্রাণে ব্যথা না লাগে। একদিন বসন্তের এক ভগ্নী আসিয়া বলিল,—"দাদা, মা কাঁদ্‌ছে।" বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল —"কেন?"

ভগ্নী। "মা সে দিন ব'লছিলেন, আপনি মোটে হাসেন না, সব সময় মুখ ভার ক'রে থাকেন, বোধ হয় তাইতে!"

খুব সম্ভব বসন্তের অভিমানের মাত্রাটা আরও কিছু বাড়িয়া গেল।

দিন একভাবে না একভাবে কাটিয়া যাইতেছে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে বসন্ত জ্বরাক্রান্ত হইল। গত বৎসর ঠিক এই সময়েই বসন্তের বসন্ত হইয়াছিল ভাবিয়া, পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া মাতা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আরও ভাবিলেন—ঈশ্বর জানিয়া-শুনিয়াই বুঝি আমার কোলের জিনিষ কোলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন!—তিন দিন বসন্তের অবস্থা একভাবে

কাটিয়া গেল ;—পিতা ডাক্তারের নিকট পুত্রের অবস্থা জানিয়া ভীত হইলেন।

আজ অবস্থা বড়ই মন্দ। রোগী প্রলাপ বকিতেছে। মাতার চক্ষে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছে।—চোখের জলে যে কি মন-গলান, প্রাণ-কান্দান শক্তি আছে, তাহা ধারণা করিতে অক্ষম। একজনের চোখের জলে অন্যকে কান্দায়,—আর একজন অপরের চোখে জল দেখিলে পাগল হয়। মাতার চক্ষে জল দেখিয়া বসন্তের ভ্রাতা-ভগ্নীগণ—কারণ না জানিয়াই —কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। বসন্ত বিকার অবস্থায় বলিল—"মা, তুমি কাঁদ কেন? এবার আমি ঠিক পাশ হব।" পুত্রের অর্থ-শূন্য বাক্য শ্রবণে মাতা চমকিত হইয়া বলিলেন,—"ছি বাবা, চুপ কর!"

বসন্ত। "না মা, একবার আমি প্রাণ পেয়েছি, এবার আমি ঠিক পাশ হব!" মাতা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে পুত্রের মুখের উপর মুখ লইয়া বলিলেন—"ছি বাপ্ আমার, ওসব ব'ল্‌তে নেই।' বসন্ত নিস্তব্ধ রহিল।

আর শরৎ সে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার ফলও বাহির হইয়াছে, কিন্তু শরতের সেদিকে লক্ষ্য নাই,—দাদার অসুখে ভাই পাগল।

ক্রমশঃ বসন্তের অবস্থা মন্দতর হইতে লাগিল। মায়ের

হাতখানি টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"মা আমি তোমার কুপুত্র, তোমাকে শুধু কাঁদাতেই এসেছিলাম, তবুও মা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন এবার পাশ হই।" মায়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বসন্ত আরও বলিল "মা, তুমি কি জাননা?—গত বৎসর ওপাড়ার 'হারাণ' ফেল্ হওয়ায় তার মা তাকে কিরূপ ভাবে গালাগালি দিয়া বলিয়াছিল—মূর্খ পুত্র যমের সমান'! কথাটা হারাণের প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল, তাই সে অভিমানে আত্মহত্যা"—বসন্ত আর বলিতে পারিল না, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মাতা পুত্রের প্রলাপবাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা নূতন নূতন ডাক্তার আনাইলেন, কিন্তু হায় কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তার বলিলেন—"রাত্রি কাটান কঠিন"। হায় ঈশ্বর! শুনি তুমি মঙ্গলময়, কিন্তু জানি না,—পুত্রটীকে অকালে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লওয়ায় তোমার কোন্ মঙ্গল সাধিত হয়!—বসন্ত যখন মাতাপিতা, ভাইভগ্নীকে কাঁদাইয়া চিরদিনের মত ইহসংসারের সকল সম্বন্ধ লুপ্ত করিল, ঠিক সেই সময় অদূরে রাজবাটীতে ঠং ঠং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু শোকার্ত্ত পরিবারের উচ্চক্রন্দনে কাটিয়া গেল।

[৩]

পরদিন বৈকালে বসন্তের পিতা শোকার্ত্ত হৃদয়ে বাহির বাটীতে বসিয়া পুত্রের অকালমৃত্যুর কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি সংবাদপত্র হস্তে একটি বালক আসিয়া বলিল—"শরৎ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে।" কিন্তু শরতের পিতা নিরুত্তর। তাঁর এই সুখের সংবাদ পুত্র-শোকের উপর —কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা হইল। তাঁর চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল। বালক সংবাদ-পত্রখানি তাঁর সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। শরতের পিতা ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া সংবাদ-পত্রখানি আরও সম্মুখে টানিয়া লইলেন। বরিশালের ডাকাতি, ঢাকার বামলা, কলিকাতায় গুণ্ডার অত্যাচার সংবাদাদির প্রতি লক্ষ্য না পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের নামের তালিকার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তিনি দেখিলেন—একটী নাম নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য কে যেন তাহার নিম্নে একটী লাল রেখা দিয়াছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন নামটী —বন্দ্যোপাধ্যায় বসন্তকুমার,— তারপর রহিয়াছে—প্রাইভেট। নামটী দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—বসন্ত মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে— 'মা, আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন পাশ হই!" তবে কি সত্যই সে পরীক্ষা দিয়াছিল? তাহা হইলে অবশ্য কোন সংবাদ পাইতাম।'

ও হয়ত অন্য কেহ হইবে। এইরূপ—পিতা কত কি ভাবিতে-ছেন—এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। তিনি পত্র পাঠ করিতে করিতে আর পাঠ করিতে পারিলেন না, সমাপ্তির পূর্ব্বেই হাত হইতে পত্র খসিয়া পড়িল। সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। একি? একাধারে সুখ ও দুঃখ। কিন্তু দুঃখের ভাগটা বড় অধিক। সুখ চাপা পড়িল, দুঃখের কঠোর আঘাতে বুকটা ভাঙ্গিয়া চুর হইয়া গেল। পত্রের প্রতি অক্ষরে তাঁহাকে বসন্তের প্রতি আকৃষ্ট করিল। দুই হাত প্রসারিত করিয়া বসন্তকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িলেন'—হায়! বসন্ত তখন পিতার স্নেহালিঙ্গন ভুলিয়া, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত, অসীম ব্যবধানে গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

পত্রখানি আসিতেছে হাজারিবাগ হইতে। পত্রে ছিল :—

"মহাশয়ের সহিত আমি পরিচিত নই। তবে আজ পরিচিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার পুত্র বসন্তকুমার গত এক বৎসর কাল আমার বাসাতেই থাকিত। তার সচ্চরিত্রে তুষ্ট হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্রাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। সে আমার এখানে থাকিয়া প্রাইভেট প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহা বোধ হয় জানেন। এ সংবাদও আশা করি শুনিয়াছেন যে, সে প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ

হইয়াছে। মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলে বড়ই সুখী হইব। ইতি—

অত্র পত্রে বসন্ত বাবাজীবন আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি পাশ হইয়াছ জানিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। তারপর, তুমি আজ প্রায় এক বৎসর কাল দেবো ও নীহারকে পড়াইয়া আসিতেছ, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমিও লজ্জায় কিছু চাও নাই,—আমিও কিছু বলি নাই, ঘরের ছেলের মতই ছিলে। উপস্থিত, তুমি কোন্ কলেজে পড়িবে স্থির করিয়া আমায় জানাইবে। নীহার প্রায় সব সময়েই তোমার কথা পাড়ে। বাড়ীতে নীহারের বিবাহ সম্বন্ধে একটী আব্দার ধরিয়াছে—যাহা হউক, তোমাদের কুশলে সুখী করিবে। ইতি।

পত্রখানি বক্ষে চাপিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বসন্তের পিতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঘরে সাঁঝের বাতি জ্বালিয়া সকলে শাঁখ বাজাইল। কেবল শোকার্ত্ত পরিবারে তখনও অন্তর বাহির ঘোর অন্ধকারে ঢাকা ছিল।

বসন্ত যখন নিদ্রিতা মাতার শয্যাপার্শে আসিয়া মুখখানি ভার করিয়া ডাকিল—“মা!” মাতার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন—

"বাপ বসন্‌রে, তুই কি 'অভিমানে' আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলি"!—ঠিক সেই সময় একটী পেচক উচ্চরব করিতে করিতে আম্র শাখা হইতে ছাদের আলিসায় গিয়া বসিল। খিড়কির পুকুরের পাহাড়ে যেন প্রতিধ্বনি হইল—"মা!" দূরে নদী-বক্ষে কে যেন প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিল—

"কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো কাদা, মেখেছি ব'লে—"

দারুণ শোকোচ্ছ্বাসে অবিশ্রান্ত অশ্রু-প্রবাহে মাতার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

নাম বদল।

বাল্যকাল হইতেই আমার প্রবন্ধাদি লেখা একটু আধটু অভ্যাস আছে। পাঠাবস্থায় বিদ্যালয়ের সভাসমিতিতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিয়াছি। অনেক সময় রাত্রি জাগিয়া দুই একটি কবিতা রচনা করিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই একছত্র লিখিয়াই ছিন্ন-কাগজখণ্ড মুষ্টি-পিষ্ট করিয়া মুক্তবাতায়নে নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কারণ—আমার জানিত সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ মন্থন করিয়াও মনোনীত মিল মিলাইতে পারিতাম না। এইরূপে অনেক কবিতা, অনেক গল্প আরম্ভ করিয়া আর শেষ করিতে পারি নাই। অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহাদের অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। কেবল একটি মাত্র যাহা রখিয়াছিলাম—তাহাই ছিল, এখনও আছে এবং থাকিবে। সুধু আছে বলিয়াই যে মাত্র চিহ্নটুকু ধারণ করিয়া এক-পার্শ্বে পড়িয়া আছে, তাহা নহে। আছে—সুখ শান্তি, স্বস্তি সান্ত্বনা, তৃপ্তি গৌরবরূপে আমার বক্ষ ব্যাপিয়া। অস্থি মজ্জায়, শিরায় শোণিতে সুধাসিন্ধুর ঢেউ তুলিয়া। ‘আছে’ বলিলে মিথ্যা বলা হয়। থাকিবে। এখনও থাকিবে। বুঝি মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। সে—কি? আমারই বাল্যরচিত একটি ছোট গল্প। সেই কথাই আজ আপনাদের বলিব।

নাম বদল।

যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি তখন আমাদের গ্রামে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার কারণ ও অবসান সকলই করুণ, সবই ব্যথাভরা। ভাবুক আমার কর্ণে একটা আর্ত্তকাহিনী প্রবেশ করিয়া ভাব ভাণ্ডারে নাড়া দিয়া, রচনারাজ্যে সাড়া জাগাইয়া দিল। অবিলম্বে একখানি ছোট খাতা বাঁধিয়া উক্ত ঘটনার ছায়া অবলম্বনে একটি গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। গল্প শেষ করিয়া, একবার দুইবার বারংবার পাঠ করিলাম, বেশ লাগিল। গল্পটি রচনা করিয়া নিজেই বেশ সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। কোন মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিব স্থির করিলাম। কিন্তু সে কল্পনা তখনকার মত ত্যাগ করিলাম।

আমার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর কিন্তু বড়ই বিশ্রী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরের আঁকা বাঁকা ছত্র; ঠিক অনেক স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরের মতই! অনেক সময় বৌ-দিদিরা রহস্য করিয়া আমাকে বলিয়া থাকেন—আমি নাকি স্ত্রীলোকেরও অধম। কারণ আমার হস্তাক্ষর নাকি তাঁহাদের হস্তাক্ষর অপেক্ষা কদাকার। লজ্জার কথা বটে।

গল্পের খাতাখানি আমার পাঠাগারের টেবেল্‌এর উপর খাতাপত্রের মধ্যেই চাপা থাকিল। মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া পড়িতাম।

যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। তারপর তিন মাসের লম্বা অবকাশ। একমাস চলিয়া গেল। একদিন শুনিলাম—

কৃষ্ণনগর হইতে আমাকে দেখিতে আসিতেছে। কেন? আমাতে এমন কি অস্বাভাবিক ও অলৌকিক আছে, যাতে করে আমাদের বাড়ীটা একজিবিসন্ ক্যাম্প হইয়া দাঁড়াইল! আমি হইলাম—দেখিবার বস্তু এবং তাহা দেখিবার জন্য লোক সমাগম হইতেছে—দেশবিদেশ হইতে। অর্থাৎ আমার বিবাহ। যদি বলেন—এখনই? আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কারণ আমি কুলীন-কুমার। আমার দাদাদেরও অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে। আমাতেও বোধ হয় সেই নিয়মই প্রতিপালিত হইবে। আমার মনে মনে যে একটুও আনন্দ হয় নাই,—সে কথা বলিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, বিবাহাসনে উপবেশন করিলে বোধ হয় অনেকটা কমিয়া যায়। বিবাহান্তে আরও কমিয়া যায়। তবে সাধারণের উপর সে নিয়ম খাটে না। ব্যক্তি ও অবস্থা-বিশেষে এ নিয়ম ধ্রুবসত্যের মতই খাটিয়া যায়। অনেককে সারা-জীবন পস্তাইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, একদিন দেখিলাম—বেশ হৃষ্টপুষ্ট-ফুট্‌ফুটে রঙের বাদসাহি চেহারার একটা বাবু আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম ইনিই আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি পাত্রীর খুল্লতাত এবং মস্ত বিদ্বান্।

বৈকালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ আসিয়া জানাইল—বৈঠকখানাঘরে আমার ডাক পড়িয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিলাম

—পাড়ার মুরুব্বিদল, বাবা ও দাদারা সেই বাবুটীকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। বাবুর সম্মুখে গিয়া বসিবার হুকুম হইল। আমি একটু সঙ্কুচিত ভাবেই বসিয়া পড়িলাম। বাবুটি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন মুরুব্বি বলিলেন—"পুলিন আমাদের ভারি লক্ষ্মীছেলে। অতি সুন্দর স্বভাব—বুঝলেন কিনা পরেশবাবু!" বাবুটী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হু, তা হওয়া ত উচিত।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একজামিনে কেমন লিখলে বাবা?" আমি জানাইলাম—"মন্দ নহে।" এইরূপ আরও দুইচারিটি কথাবার্ত্তার পর বাবুটি সুবোধকে বলিলেন—"ওহে খোকা একটু কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে এসো!"

আমি মনে মনে ভাবিলাম—কেন? 'ডিক্‌টেসন্' দিবে নাকি? এ আবার কোন্ দেশী বিবাহ? আমায় কি পাত্রী দেখিতে আসিয়াছে যে দেখিয়া লইবে—আমি লেখা পড়া জানি কি না, পান সাজিতে জানি কি না, রুটি বেলিতে পারি কি না! আবার ভাবিলাম—না, হয় ত দানসাম-গ্রীর ফর্দ্দ করিবে।

অল্পক্ষণ পরে ভ্রাতা আমার দোয়াত কলম ও ভিতরকার শাদা কাগজ বাহির করিয়া উল্টাইয়া ভাঁজ করিয়া একখানা খাতা আনিয়া বাবুর সম্মুখে রাখিল। বাবু আবার সেগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"তোমার যা মনে আসে—পাঁচসাত লাইন্ বাঙ্গালা লেখ।" এই সেরেছে! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই

রাত্রি হয়। বাঙ্গালা লেখা আমার যে বিশ্রী। কিন্তু এ কি রকম দেখা? মনে মনে একটু রাগ হইল। একটু ভয়ও হইল। বাঙ্গালা লিখিলাম। বাবুটি বলিলেন—"এইবার ঐটার ইংরিজি কর।"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল! বুকের মধ্যে দম্-দম্ করিতে লাগিল; কান দিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। এ ত পুরাদস্তুর 'টেপ', এই টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবেই আমি বিবাহের জন্য 'এলাউ' হইব? এমন বিবাহ না হয় না-ই করিলাম। আজকাল হইলে আমি স্পষ্ট বলিয়া দিতাম—মহাশয় এক্জামিন্ দিয়া বিবাহ করিতে চাহি না। কিন্তু তখন বলিতে পারি নাই।

বাবা ও দাদাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার উপরই নিবদ্ধ ছিল। ভাবিলাম বুঝি আমার ভাবান্তর তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। কি করিব? অগত্যা ইংরেজি করিলাম।

খাতাখানি লইয়া বাবু আমার লেখাটা একবার দেখিয়া পার্শ্বস্থ ব্যাগের মধ্যে রাখিলেন। সুবোধ বলিল "ওখানা যে ব্যাগে রাখিলেন?" বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"নিয়ে যাবো। বাড়ীতে হাতের লেখাটা একবার দেখাব।" কথাটা বিদ্রূপের সুরেই আমার কানে পৌঁছিল। সেখানে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাবুর

হুকুম হইল—"আচ্ছা এইবার তুমি যেতে পার।" আমি চলিয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম—এ বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না।

একদিন শুনিলাম—বড়দাদা পাত্রী দেখিতে কৃষ্ণনগর যাইতেছেন। সঙ্গে যাইতেছে—সুবোধ। সুবোধকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—"দ্যাখ, হাতের লেখা নিয়ে আসিস্। ঊর্দ্ধ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, উদ্বোধন, ব্যয় ইত্যাদি কঠিন কঠিন বানান জিজ্ঞাসা করিস্। কড়া, বুড়ি, শতকে, নামতা জিজ্ঞাসা করিস্। সামনে বসিয়ে পান সাজিয়ে দেখ্‌বি।" মনে মনে ভাবিলাম এই সব যদি পারে, তবেই করিব—নতুবা নহে।

ভ্রাতা আমার মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল—"সে সব কিছু বোলতে হবে না দাদা, আমি সব জানি।"

পাত্রী দেখিয়া দাদা ফিরিয়া আসিলেন। আমি আমার পাঠগৃহে গিয়া একখানা বই খুলিয়া বসিলাম। কিন্তু কান থাকিল বাহিরে।

বাহিরে পাত্রী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি সব কথা শুনিতে পাইতেছিলাম না। কেবল শুনিলাম—"মেয়েটী বেশ সুন্দরী।" লাখ কথার এক কথা। সমস্ত কথাবার্ত্তার এইটুকুই হইল চুম্বক—মেয়েটি বেশ সুন্দরী। আমি কানে প্রাণে কেবলই শুনিতে লাগিলাম— মেয়েটি বেশ সুন্দরী।

মনে মনে কত কল্পনা করিতেছি—এমন সময় সুবোধ হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল— "দাদা আপনি যা যা বলে দিয়েছিলেন সব করেছিলাম, কিন্তু ঠকাতে পারিনি। দ্বিতীয় ভাগের শক্ত শক্ত বানান ধরেছিলাম, কিন্তু একটাও ভুল যায়নি। কুড়ির ঘর পর্য্যন্ত নামতা জিজ্ঞাসা কোরলাম,—টক্ টক্ ক'রে জলের মত বোললো আর এই দেখুন হাতের লেখা।" পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। আমি কাগজ লইয়া দেখিলাম—তাহাতে মাত্র একটি নাম লেখা আছে। আহা নামটিও বেশ! দুই তিনবার নামটি পড়িলাম—শ্রীমতী মণিমালিনী দেবী। হস্তাক্ষর অনেকটা আমারই মত। অন্ততঃ আমার হস্তাক্ষর অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নহে। একদিন মনে স্থির করিয়াছিলাম —এ বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না। আজ তাহার বিপরীত ভাবিলাম। আহা—নামটী বেশ, মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। কিন্তু কি হইল? বিবাহের সমস্তই এইরূপ স্থির হইয়া সামান্য একটা কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমারও বুক ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর কখনও বিবাহ করব না।

[২]

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্-এ পড়িতেছি। পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া একদিন আমার সেই গল্পের খাতাটি

অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। সুবোধকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"সেই বৈশাখ মাসে কৃষ্ণনগর থেকে আপনাকে দেখতে এসেছিল। সেই সময়ে একখানা নিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে আপনাকে লিখ্‌তে দিয়েছিল তারপর সেই বাবুটী ব্যাগে পূরে নিয়ে গ্যালো!"

"ব্যাগে পূরে নিয়ে গ্যালো কিরে? আর সে বুঝি আমারই খাতা? দেখেছ, সে যে আমার বিশেষ দরকারী খাতা।"

"দেখুন ভাল করে খুঁজে। সেখানা নাও হতে পারে। তবে একখানা খাতা আমি নিয়েছিলাম—এটা ঠিক।"

"আর দেখ্‌তে হবে না। নিশ্চয়ই সেই খাতা।"

অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও খাতা পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে একটী আশাও আমাকে ত্যাগ করিতে হইল। হায় হায়—অমন গল্পটি। ভাবিয়াছিলাম—যদি ঐ গল্প হইতে ছাপার অক্ষরে আমার নামটা বাহির করিতে পারি। কিন্তু আর বুঝি হয় না। ঘটনা স্মরণ থাকিলেও তেমনটী বুঝি আর দাঁড় করাইতে পারিব না।

ঠিকানা জানা ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গোপনে সেই বাবুটির নামে কৃষ্ণনগরে একখানি 'রিপ্লাই কার্ড' লিখিলাম। কিন্তু জবাব আসিল—"ক্ষমা করিবেন। খাতাখানি হারাইয়া গিয়াছে।" পত্রে কোন নাম নাই। ঠিক বুঝিতে

পারিলাম না—পত্রের হস্তাক্ষর কোন স্ত্রীলোকের, কি আমারই মত কোন পুরুষের। যাহা হউক, খাতার আশা আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি বি-এ পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছি। আজকাল দেখিতে পাই—সাহিত্য ক্ষেত্রে ছোট গল্পের পল্টনই প্রায় সমস্ত স্থানটুকুই অধিকার করিয়া গর্ব্বোন্নত বক্ষে সমস্ত মাসিক পত্রের বক্ষে 'কুইক্-মার্চ' করিয়া চলিয়াছে। এই সুযোগে অনেকেই স্ব স্ব নাম জাহির করিয়া একটু একটু স্থান করিয়া লইতেছেন। আমিও এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্লট্ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাই কই? অগত্যা বাল্য-রচিত সেই পুরাতন গল্পের ঘটনা লইয়াই পুনরায় গল্প রচনা করিলাম। কিন্তু ঠিক সেরূপ হইল না। কোন একটি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে গল্পটী পাঠাইয়া দিলাম।

তিন দিন পরে গল্পটি ফিরিয়া আসিল। একটা হতাশের দীর্ঘশ্বাস আমার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি দমিয়া গেলাম। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, দুঃখের সহিত আপনার গল্পটি প্রত্যর্পণ করিতেছি। কারণ আপনার গল্প পাইবার একদিন পূর্ব্বে ঠিক আপনার ঐ গল্পের প্লটেরই আর একটি গল্প আমরা পাইয়াছি। সে গল্পটির

ভাষা সরল, ভাব সুস্পষ্ট! গল্প দুইটি যেন ঠিক একই ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেটি সুখপাঠ্য সেইটিই আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব বলিয়া মনোনীত করিয়াছি। নিবেদন ইতি।"

পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার গল্প প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এ প্লট্ অন্যে কি করিয়া পাইল? আবার ভাবিলাম—মানুষের কল্পনায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য ঘটনার ছায়া প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কে সে যে আমার সাহিত্যক্ষেত্রের এক খানি স্থানও চিরদিনের মত অধিকার করিয়া লইল।

আকুল উদ্বেগে দিন অতিবাহিত করিয়া পরমাসে মাসিক পত্র আসিবামাত্র প্রবন্ধসূচী দেখিলাম—তিনটি গল্প আছে। ৩৫৪ পৃষ্ঠা খুলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িতে লাগিলাম—

"শেষ চিহ্ন।"

—আজ যে গল্প আপনাদের বলিব তাহা আমার নহে। এ আমার 'তার' রচিত। আমি মাত্র প্রকাশক। তবে গল্প বলিবার পূর্ব্বে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি, আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র-ঝলসিত দ্বিপ্রহরে নিদ্রায় তন্দ্রায় আমাদের বাড়ীখানি নীরব নিস্তব্ধ। আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখি 'সে' তাহার ষ্টিলট্রাঙ্ক খুলিয়া—বস্ত্রাদি, রুমাল, সাবান, এসেন্সের শিশি ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গৃহের মেঝেয় ছড়াইয়া পুনরায় ঝাড়িয়া, ভাঁজ করিয়া বাক্সে সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকের সময় অতিবাহিত করিবার এ একটি প্রধান উপায়। কোন কিছু করিবার নাই,—সুসজ্জিত বাক্স খুলিয়া, জামা কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া ভাঁজ করিয়া, বাক্স সাজাইয়া, পুরাতন পত্রগুলি পুনরায় পড়িয়া সময় কাটাইয়া দিল।

পা-টিপিয়া গিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। বাক্সের সর্ব্ব নিম্ন হইতে সে রুমালে জড়ান কি একটা বাহির করিল। রুমালের বন্ধন মুক্ত করিয়া বাহির করিল একখানি খাতা। পাতা উল্টাইয়া সে কি পড়িতে লাগিল। কিসের

খাতা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল। অকস্মাৎ গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানি চাপিয়া ধরিলাম। সে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই দুই হস্তে খাতাখানাকে কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"তোমার পায়ে পড়ি, তোমার পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও।" আমি বলিলাম—"তোমার এমন কি গোপনীয় আছে, যা তুমি আমাকে দেখাতে চাচ্ছ না?"

"তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। তবে আজকের মত ছেড়ে দাও। আর একদিন দেখাবো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

আমি—"না, আমি দেখবোই" বলিয়া খাতাখানা ধরিয়া একটু জোরে টান মারিলাম। উপরের দুই তিনখানা পাতা ছিঁড়িয়া গেল। উপুড় হইয়া বুকের মধ্যে খাতাখানা চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল—"ছাড়বে না? ছাড়বে না? পায়ে পোড়লাম—তবুও ছাড়বে না?"

সে কাতর কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম—"আচ্ছা যাও, না দেখালে! দুদিন বাদে দেখাতে চাচ্ছ, অথচ আজ দেখাবে না।" অভিমানের ভাণ করিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। সে কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে

আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমিও চাহিয়া দেখিলাম—মুখখানি তাহার লাল হইয়া গিয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"খাতা ছিঁড়ে দিলাম ব'লে রাগ হ'লো নাকি?"

নত দৃষ্টিতে সে বলিল—"না, আমি আর রাগ করবো কেন? আমার ভয় হয়েছিল—তুমি বুঝি রাগ করলে!"

"রাগ ত করি, কিন্তু তা বজায় রাখতে পারি কই কালো?"

একটু মৃদু হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বাক্স সাজাইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—খাতাখানা কিসের? বোধ হয় গানের। সেই কারণ লজ্জায় আমায় দেখাইল না।

একদিন তাহার পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল—তাহার পিতাঠাকুর মহাশয় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমার নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কয়েকদিন পরে জানিলাম-তাহার পিতা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। পরদিন তাহাকে আনিতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম—'সে' আমার উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। আহার নিদ্রা ভুলিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলাম। কিন্তু কি হইল? সকল যত্ন, সকল চেষ্টা উপেক্ষা

করিয়া সে আমার আমারই ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল। আমি বালকের মতই কাঁদিতে লাগিলাম।

দ্বিপ্রহরে শ্বশুরালয়ের পরিচিত নির্দ্দিষ্ট কক্ষটিতে বসিয়া আছি। সম্মুখে দেওয়ালগাত্রে তাহারই একখানি প্রতিকৃতি সংলগ্ন ছিল। তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুজলে দৃষ্টিরোধ হইল। চক্ষু মুছিয়া পুনরায় চাহিলাম; সেই ফটোর পেরেকেই তাহার চাবির তোড়াটি টাঙ্গান ছিল। আর তাহারই নিম্নে একখানি টুলের উপর, রঙ্গিন কাপড়ের আবরণে ঢাকা তাহার বাক্সটী বসান ছিল। উঠিয়া চাবির তোড়াটী লইয়া বাক্স খুলিলাম। যেমন সাজান তেমনই আছে। নানা রঙ্গের ছোপান কাপড়, জরিপেড়ে কোঁচান কাপড়, সেমিজ বডিজ, সায়া সাবান, আলতা, আয়না, রুমাল তোয়ালে, এসেন্স আতর যেমন গোছান তেমনই আছে। একে একে সমস্ত বাহির করিলাম। প্রতিদ্রব্যটীতে যেন তাহার গন্ধ ও স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারই এক খানি রুমাল লইয়া চক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

সর্ব্বশেষে যাহা বাহির করিলাম, তাহা সেই—রুমালে জড়ান খাতা। যে খাতা একদিন তাহার বুকের ভিতর হইতে সবলে টানিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু পারি নাই। আর

আজ? আজ তাহা অনায়াসে আমি আমার শোকদগ্ধ শূন্য বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—কেহই বাধা দিল না। কাহারও দুইখানি ক্ষিপ্রহস্ত তাহা ছিনাইয়া লইল না। কাতর কণ্ঠে কেহই বলিল না—ছেড়ে দাও ওগো ছেড়ে দাও। পায় ধরি—ওগো ছেড়ে দাও।

খাতার পাতা উল্টাইয়া কিয়দংশ পড়িয়া দেখিলাম। তাহা একটী গল্পের অবতরণিকা। আদ্যন্ত গল্প পাঠ করিয়া দেখিলাম—সেটি একটি সুন্দর করুণ গল্প। কিন্তু এ কাহার রচিত? এ হস্তাক্ষর কি—হ্যাঁ তাহারই হস্তাক্ষর বলিয়া ভ্রম হয়। বোধ হয় তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেকার লেখা।

নির্ব্বাক হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার বাক্সের সুঘ্রাণে প্রকোষ্ঠের বদ্ধ বায়ূ মাতাইয়া আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ফটোয় বসিয়া সে যেন আমারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল খাতাখানাকে বক্ষে করিয়া শয্যায় গিয়া লুটাইয়া পড়িলাম।

"কালো, কালো! দেহের শক্তি, মনের স্ফূর্ত্তি কালো আমার, তোমাতে এমন গুণ ছিল তা একদিনের জন্যও আমাকে জানতে দাও নাই! কেন দাও নাই কালো? এই বুঝি তোমার ভালবাসা? এতদিন দেখতে চেয়েছিলাম—লজ্জায় দেখাও নাই। তুমি বর্ত্তমানে এ সুখ দাও নাই কেন কালো?"

উপাধানে চক্ষু মুছিয়া গল্পটী পুনরায় পড়িবার চেষ্টা করিলাম। চক্ষুজলে অন্ধ হইলাম। পড়িতে পারিলাম না।

আমার বুকের কলিজা, আমার দেহের প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার সেই 'শেষচিহ্ন' খাতাখানি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কেন সে তাহার নিজগুণকে নিভৃতান্ধকারে চাপা রাখিয়া গুণের অবমাননা করিয়াছিল,—সেই পাপের দণ্ডস্বরূপ আজ আমি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলাম। স্বর্গের দেবী তুমি কালো, স্বর্গ হইতে তোমার হতভাগ্য স্বামি-প্রদত্ত এ শাস্তি মানিয়া লইয়া তাহাকে কৃতার্থ কর। আর বুঝবো তোমার 'প্রেমের টান, যদি অবিলম্বে তোমারই পার্শ্বে তাহার জন্য একটুখানি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজ আপনাদের গল্প বলিব, তাহা আমার নহে—'তার'। আমি মাত্র প্রকাশক; তাহার গল্প তাহারই নামে নিম্নে প্রদত্ত হইল। সবিনয় প্রার্থনা—অবজ্ঞা ক'রবেন না; অমর্য্যাদা করিলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। এইটুকু তার মধুর স্মৃতি, ওগো এইটুকু তার 'শেষ-চিহ্ন'!

গল্পটি নিম্নলিখিত রূপ :—

[৩]

কোন ভদ্রলোকের প্রকাশিত উপরোক্ত গল্প পাঠ করিলাম।

কিন্তু এ কি? পুনরায় পাঠ করিলাম—কিন্তু এ কি? এ যে আমার সেই বাল্য-রচিত গল্প। নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সত্যই ত এ আমারই সেই গল্প। অক্ষরে অক্ষরে, ছত্রে ছত্রে এ সে আমারই রচিত গল্প। হায় হায়, যে গল্প হইতে ভাবিয়াছিলাম—নামটা ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইব, সে গল্প আমার কে হারিয়া হইল! কে আমার পোষিত বাসনায় ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া 'লেখক' নামের স্থানটুকু অধিকার করিয়া লইল!

ওকি? গল্পশেষে লেখকের নামের স্থানে ও কাহার নাম? যে স্থানে আমার নাম দেওয়া ছিল, সেখানে ও কি নাম? এঁ্যা!

মাসিক পত্রখানা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। বিস্ময়ে আত্ম-হারা হইলাম। শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এক বিচিত্র যানে আরোহণ করিয়া যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। চক্ষের সম্মুখ দিয়া একখানি সুন্দর-দৃশ্য চিত্র ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

এ কাহার নাম? ঈর্ষার পরিবর্ত্তে শান্তি আসিয়া আমার প্রাণ শান্ত শীতল করিয়া দিল। কোন এক অজানিত সুখস্পর্শের শৈত্য অনুভূতির শিহরণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া আনন্দ-প্রস্রবণে অন্তর ভরিয়া গেল। উল্লাস-উৎসে মন মাতিয়া গেল।

এ কাহার নাম? যে নাম সজাগ প্রহরীর মতই আমার মনটার

উপর দিবানিশি পাহারা দিতেছে, এ নাম সেই নাম। যাহার কল্পিত মধুর মূর্ত্তিখানি আজও আমার সমস্ত অন্তর বাহির অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, এ তাহারই নাম।

সার্থক আমার গল্প রচনা, আমার সামান্য খাতাখানি যে তাহার নিকট একটুও আদর পাইয়াছিল, আমার ক্ষুদ্র গল্প যে তাহার প্রাণে একটুও স্থান পাইয়াছিল—ইহাই আমার চরমতৃপ্তি শীতল সান্ত্বনা।

মাসিকপত্রখানা বক্ষে চাপিয়া টেবিলের উপর মস্তক রাখিলাম।

একি ঘটনা বিপর্য্যয়! একি শান্তি? একি সুখ? আমার লেখার সে আজ লেখিকা। কিন্তু সে নাম মুখে আনিবার কোন অধিকার আমার নাই। তথাপি একবার, মাত্র একবার—ওগো একটিবার, নির্লজ্জ বেহায়ার মতই সেই নামটি, সেই বেশ নামটি একবার মুখে আনিব! সে নাম—"মণিমালিনী দেবী।"

প্রবাসের একদিন।

কি একটা অসম্বদ্ধ ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সুপ্ত সহরের মাঝে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া গবাক্ষ-পথে চাহিয়া দেখিলাম---এখনও প্রকৃতি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে ঠিকা গাড়ীর আড্ডায় এক্কাওয়ালারা গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে হিন্দিতে হল্লা করিতেছে। গির্জ্জায় গম্ভীর শব্দে চারিটা বাজিয়া গেল। সিক্ত-হাওয়ায় একটু শীত শীত বোধ হইতেছিল। জানালার পাখি বন্ধ করিয়া অবশিষ্ট রাত্রটুকু বসিয়া কাটাইব স্থির করিয়া, চক্ষুমর্দ্দন করিয়া উঠিয়া বসিলাম। সেরূপ সময়ে আর কিসের আশা করা যায়? ভাবনায় ঘিরিয়া বসিল। কিসের ভাবনা? নিজের-স্বার্থান্ধ ও মোহান্ধ মনে আর কিসের ভাবনা স্থান পায়? মন প্রাণ যাহা চায়, তাহা না পাওয়াটা একটা মস্ত দুঃখ। তাই এ সংসার দুঃখের আগার। মন কি চায় জানি না। কি পাওয়াটা প্রকৃত সুখ জানি না। তবু সদাই চাই। অনেক পাইয়াছি। তবু কি যেন পাই নাই। তাই ভাবি এ সংসারে সুখ নাই—শান্তি কোথায়? বাসনার পূরণ নাই—তাই আত্মার তৃপ্তি নাই। পাইয়া

প্রাপ্তি স্বীকার করি না, তাই আর পাই না। অতএব সংসার অশান্তিময়। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

কতক্ষণ ভাবিয়াছি জানি না। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে একটা ভাবের লহর তুলিয়া কে যেন গজলে গাহিল—"দিল্ যো মাঙ্গে—সোঁ সীতারাম !" সুরের মূর্চ্ছনা আমার অন্তরে আঘাত করিল। দ্বার খুলিয়া বারান্দায় গিয়া দেখিলাম—তখনও রাস্তার আলোগুলি জ্বলিতেছে। পূর্ব্বাকাশে দিবসের প্রথম আলো—ফুটিয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে ঝাড়ুদারের ঝাড়ুর শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া নিম্ন দৃষ্টিতে দেখিলাম—যে গাহিতেছে সে ঝাড়ুদার। সত্যই সে ঝাড়ুদার। অন্তরেও সে ঝাড়ুদার বাহিরেও সে ঝাড়ুদার। বাহিরে সে,—স্বার্থান্ধ মানবের সমস্ত দিবসের পদ সংগৃহীত ধূলিরাশি হস্তের ঝাড়ুতে ঝাড়িয়া ফেলে। অন্তরে সে,—দিবসের প্রথম অরুণোদয়ে নিদ্রিত মানবকে পবিত্র নাম শুনাইয়া সজাগ করিয়া, তাহাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মলিনতা, বিজড়িত আবিলতা মধুর মূর্চ্ছনায় মুছিয়া দেয়, তাই সে প্রকৃত ঝাড়ুদার।

আবেগ উদ্বেলিত বুকটাকে রেলিংএর উপর চাপিয়া দেখিতে লাগিলাম—ঝাড়ুদার ফুটপাথ্ সাফ করিতেছে, আর গাহিতেছে —"দিল্ যো মাঙ্গে সোঁ সীতারাম।" অনেক গান শুনিয়াছি, কিন্তু মনে হইল এমনটি কখনও শুনি নাই। অনেকক্ষণ শুনিলাম।

জানি না—আমার অজ্ঞাতসারে, আমার উচ্ছ্বাসিত অন্তরের গুপ্ত ভক্তিটুকুর নিদর্শন স্বরূপ এক বিন্দু অশ্রুজল ঝাড়ুদারের চরণে গিয়া মিশিয়াছিল কিনা। কি শিক্ষা দিলে ঝাড়ুদার? "দিল্ যো মাঙ্গে—সোঁ সীতারাম।" "পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।" খুব শিক্ষা দিলে ঝাড়ুদার। এস ঝাড়ুদার, আমার হৃদয়ের মলিনতা, মনের সঙ্কীর্ণতা তোমার ঐ হাতের ঝাড়ুতে ঝাড়িয়া দিয়া যাও। নতুবা ইহা যাইবার নহে। সত্যই' ত'—"দিল যো মাঙ্গে—সোঁ সীতারাম।" কিন্তু পাই কই? কেমনে পাওয়া যায়? কে বলিবে?

[২]

বেলা প্রায় আটটা বাজে। হাতে বিশেষ কোন কাজ নাই। সকালের ডাকের আশায় একরূপ পিয়নেরই পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। অনেকদিন কাহারও পত্রাদি না পাইয়া একটু চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু পিয়ন আসে কই? কেবল দেখিতেছি—১১৯৫ নং, ১২৭৫ নং ইত্যাদি মিউনিসিপ্যালিটির নম্বরের ছাপ দেওয়া ছোট বড় অসংখ্য একা ঝুনুর ঝুনুর ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। মাড়োয়ারি বেহারি, কাচ্চি, মান্দ্রাজি, বাঙ্গালি দেশোয়ালি ইত্যাদি নানা দেশীয় হিন্দু-মুসলমানে রাস্তা পরিপূর্ণ। শুনিতেছি কেবল—("লে রোহু মছলিএ। লে—উপরি। লে—কয়থা। লে—কেলা মেওয়া—গরিনারিয়েল্।" ইত্যাদি) বিভিন্ন

ফেরিও-য়ালার নানান সুরের হাঁক্। এই জনতার মধ্য হইতে আমার চঞ্চল চক্ষুদ্বয় একটীও ডাক-পিয়ন খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইল না। বড়ই বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। টেবিলের উপর পা ছড়াইয়া, চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া, চক্ষের সম্মুখে গত মাসের "মাধুরী" খানা খুলিয়া ধরিলাম, এবং যে কোন কিছুতে মনোনিবেশ করিবার বৃথা প্রয়াশ পাইতেছি,—এমন সময় "বন্দে" বলিয়া যে গৃহে প্রবেশ করিল সে লক্ষ্মী (লক্ষ্মী চৌধুরী)। সঙ্গে ননি (ননি সিংহ)। এলাহাবাদের চিরস্থায়ী বাঙ্গালির মধ্যে "নমস্কার বা প্রণামের" পরিবর্ত্তে "বন্দে" বলা প্রচলন আছে। যাহা হউক এখানে আমি যত গুলি বন্ধু জোগাড় করিয়াছি, তন্মধ্যে এই লক্ষ্মীই আমার প্রধান। লক্ষ্মীর অনেক গুণে আমি মুগ্ধ! এই পরোপকারী, পরিশ্রমী আমায়িক যুবার সরলতা মাখা প্রাণ-খোলা হাসিতে আমাকে তাহার বড় নিকট বন্ধু করিয়া লইয়াছে। কেন কি জানি লক্ষ্মীও আমাতে বড় আকৃষ্ট। আমি বেশ বুঝি, আমার সঙ্গটা তাহার বড়ই ভাল লাগে। সে তাহার অধিকাংশ অবসরটুকু আমার নিকট বসিয়া অতিবাহিত করে। আমার গান তাহার নিকট স্বর্গীয় সঙ্গীত বলিয়া বোধ হয়। আমার কণ্ঠস্বর তাহার নিকট বীণার তান। তাই সে যখন তখন আমার নিকট গানের বায়না করে। আমি গান গাই। সে বিভোর হইয়া শ্রবণ করে। অবাক হইয়া এরূপ ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া থাকে, যেন সে

গানের ভাষা, ভাব, সুর, মূর্চ্ছনা আমার কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইয়া এক গ্রাসে সমস্তটা উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পরে না। তাই আমার গান থামিলে, সে বড় অস্বস্তি প্রকাশ করে। সে আমার গান ভালবাসে—আমি তার হাসি ভালবাসি। তবে আমি ভালবাসি বলিয়াই যে লক্ষ্মী শুধু আমারই নিকট হাসির ফোয়ারা ছাড়িয়া দেয় তাহা নহে, সে হাসির বড়ই অপব্যয় করে। যেখানে সেখানে, যার তার সম্মুখে, অযাচিত ভাবে—সে তাহার হাস্য ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দেয়। দিবে না কেন? হাসি? সেত' অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। চির-কাল দান করিয়া যাও—ফুরাইবে না। যে পারে—সেই পুণ্যবান্ সেই সুখী: যে পারে না, যে হাস্য-ভাণ্ডারের দ্বারে তালাবদ্ধ করিয়া, কালপর্দ্দা বিছাইয়া দেয়,—সেত' পাপী, চির-দুঃখী। তাহার শাস্তি—অন্তর-রুদ্ধ হাসির উত্তাপে—চিরদিন ঝলসিয়া, গুমরিয়া মরিবে—অথচ খরচ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই।

আমি লক্ষ্মীর হাসি ভালবাসি। পাইও খুব। অনুরোধ করিতে হয় না। অযাচিত ভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মী যাহা ভালবাসে, সে ঠিক তাহা পায় না। আমার গান,—সে ঠিক কৃপণের ধন। আধলাকে টাকা জ্ঞানে লোহার সিন্দুকে ভরিয়া রাখার মত—অন্তরে গোপনে এরূপ ভাবে চাপা আছে যে—আমার উপর রাহা-জানি করিলেও কেহ তাহা হস্তগত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমার গান,—সভসা, সকলের সম্মুখে সহজে বাহির করি না। যদি কখনও 'একবার শুনিয়া দেখার মত,' নির্জ্জনে বাহির করি, ঠিক নিজের নিঃশ্বাস শব্দেই চমকিত হইয়া যেন পুনরায় তাহা চাপা দিই। তাই লক্ষ্মী প্রায় কিছুই পায় না। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক অনুরোধের পর যাহা দিই তাহাও ঠিক যেন—আসলের সুধ, দোকানদারের ফাও।

লক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিয়াই খুব খানিকটা হাসিল। তারপর উভয়ে (লক্ষ্মী ও ননী) দুইখানা চেয়ারে উপবেশন করিল। আমি টেবিলের উপর হইতে চরণদ্বয় গুটাইয়া লইয়া, মাধুরী খানা দূরে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি খবর। লক্ষ্মী একটু হাসিয়া বলিল—খবর আর কি? চল আজ একবার মৎস্য শিকারে যাওয়া যাক্।

ড্রয়ারের ভিতর হইতে সিগারেট্ কেস বাহির করিয়া ননির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন তোমাদের কি আজ আফিস্ নাই?" আর যায় কোথা লক্ষ্মীর সে কি হাসি? বাপরে বাপ! দম্ বন্ধ হইয়া মারা যায় আর কি! ননি "থাম্ থাম্" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। আর থাম্! সে দুর্জ্জয় হাসি কি আর সহজে থামে? শৃগালের ডাক্ বা ঐক্যতান থামিবার পূর্ব্বে যেমন দুই একটী শৃগাল মুহূর্ত্তান্তরে পরস্পরে ফাঁকে ফাঁকে শেষ টান বা রেশ রাখিতে রাখিতে একেবারে থামিয়া যায়,

আমাদের লক্ষ্মীর হাসিও ঠিক তদ্রূপ অনেক ককাইয়া ঘিঘাইয়া তবে থামিল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া, চক্ষুজল মুছিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে লক্ষ্মী বলিল—"কেন রবিবারেও কি আফিসে যেতে হবে?" আমার চমক ভাঙ্গিল। তখন বুঝিলাম—কেন আজ পিয়ন আসিল না। আজ প্রথম ডাক বিলি বন্ধ। আমি "ওহো ঠিক কথা" বলিয়া টেব্‌লের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া, চেয়ার খানা কিঞ্চিৎ পিছু হটাইয়া ঠিক হইয়া বসিলাম। আমাদের মৎস্য শিকারে যাওয়া স্থির হইল।

[৩]

এলাহাবাদ অক্‌ট্রাই' বা চুঙ্গি ঘাট ও ফোর্টের (কেল্লার) মধ্যস্থলে যমুনা তীরে দুই তিন খানা বজ্‌রা ও চার পাঁচ খানা বোট্ বান্ধাছিল। বেলা প্রায় একটার সময় আমরা চারিজন গিয়া দুই খান বজ্‌রার ছাদ অধিকার করিয়া বসিলাম। বজ্‌রার মালিক বা অন্য কেহ সে সময় উপস্থিত ছিল না। বলা বাহুল্য, আমরা মাছ ধরিতে আসিয়াছি। অন্য কোন স্থানে বসিলে অসু-বিধা হইবে বিবেচনা করিয়া আমরা বজ্‌রায় উঠিলাম। এক ছাদে বসিল—লক্ষ্মী ও নর্নি। আর এক ছাদে—ইন্দু ও আমি (ইন্দু চাটুজ্জে)।

বেলা দুইটা বাজে; আমরা মাছ ধরিতেছি। যদিও, যমুনায় মাছ আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার বেশ সন্দেহ হয়। কারণ

বসিয়া অবধি মাছে কাহারও টোপ স্পর্শ করে নাই। ননি ঘন ঘন সিগারেট্ ধরাইতে লাগিল। ইন্দু অনর্থক খ্যাঁচ্ মারিয়া বড় মাছ পলাইল বলিয়া দুঃখের ভাণ করিতে লাগিল। আর লক্ষ্মী কেবল হাসিতে লাগিল। আমার মাছ ধরিবার প্রতি মোটেই লক্ষ্য ছিল না। আমি দেখিতেছিলাম- আমাদের দুই পার্শ্বে, জলে স্থলে, ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ কোন লুপ্ত স্মৃতিটাকে জাগরূক করিয়া, অস্পষ্ট চিত্রের মত এখনও ভগ্নবক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছে। গগনস্পর্শী স্তম্ভের ছিন্ন মস্তকগুলি যমুনা তাহার শীতল বক্ষ পাতিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তাহা এখনও কোন্ অতীতকালের পুরাতন কাহিনীটাকে প্রচার করিতে চাহিতেছে। ৩।৪টী প্রস্তর গঠিত সুড়ঙ্গ, যমুনার উচ্চ পাহাড় হইতে নামিয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। বর্ষার ভরা যমুনার গেরুয়া রংয়ের ঢেউগুলি জননীর স্নেহ হস্তের মত আসিয়া ঠিক সন্তানগাত্রে নিদ্রা-আকর্ষণী মৃদু করাঘাতের মতই, সেই ছিন্ন স্তম্ভ-শিরে আঘাত করিতেছে। সেই অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাতে ঠিক জননীমুখ-নিঃসৃত নিদ্রাদেবীর আবাহন সঙ্গীতের মতই একরূপ ঐক্যতান রচিত হইয়া, সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু পতিত স্তম্ভ যেন দুষ্টছেলের মতই সলিল-শয্যা হইতে মস্তক উন্নত করিয়া বলিতেছে—'আমরা এক দিন ছিলাম, এখনও আছি, কিন্তু আমাদের উত্থানশক্তি চিরদিনের মত

বিলুপ্ত হইয়াছে।' প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা ঐশ্বর্য্যের গৌরবের শেষ জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র। একটা লুপ্ত স্মৃতির গুপ্ত বেদনা। হা হুতাশ ও মরম যন্ত্রণা।

আমি ননিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ হে, বলিতে পার এ ruins কাহাদের?"

ননি সিগারেটে একটা জোরে টান মারিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"মুসলমানদের।"

লক্ষ্মী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"না—না তুমি জান না।" —উভয়ে অনর্থক তর্ক জুড়িয়া দিল। ইন্দু চিৎকার করিয়া উঠিল—আরে, তোমরা থাম না? আমার টোপ খাচ্ছে।" যদিও সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উত্তরাকাশে নজর পড়ায় দেখিলাম—বেশ একটু মেঘ উঠিয়াছে। কিন্তু শীঘ্র কিছু হইবে বলিয়া বোধ হইল না। সে বিশ্বাস অধিকক্ষণ টিকিল না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সূর্য্যালোক নিভিয়া গেল। বিশ্বসংসার যেন সন্ধ্যার আঁধারে ঢাকিয়া গেল। তখন বেলা ৪টা, মৃদু মন্দ হাওয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তান্তরে প্রবলরূপ ধারণ করিতে লাগিল। যমুনার ক্ষুদ্র ঢেউগুলি বৃহদাকার ধারণ করিয়া আমাদের বজরার তলদেশে আসিয়া সশব্দে আছারি বিছারি খাইতে লাগিল। বজ্‌রা ঈষৎ দুলিতে লাগিল। নানা জাতীয় জলচর পক্ষী বিকট রব করিতে

ঘুরিতে ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। মস্তকোপরি কালমেঘের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল। আর সেই কাল• মেঘের কোল দিয়া শুভ্র-মল্লিকার ছিন্ন মালার ন্যায় বকশ্রেণী সাঁ সাঁ শব্দে কোথায় সরিয়া যাইতে• লাগিল। ইন্দুর ভাব উথলিয়া উঠিল। সে "মেঘ-দূত" হইতে দু চার ছত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। ননির ধমকে থামিয়া সে পুনরায় বলিল—"দেখ, এই হুড়াহুড়ি মারামারি করিয়া কোন রকমে প্রথমে প্রবেশ করিতে পারিলে গ্যালারির প্রথম বেঞ্চ অধিকার করা সহজ।"

আমি বলিলাম—"তার মানে?"

মুরুব্বিয়ানা চালে ইন্দু বলিল—"তার মানে সোজা। এই যে সব বাবুরা এক একজন মস্ত মস্ত সাহিত্য-গোলন্দাজ, সাহিত্য-পালোয়ান নাম লইয়া গিয়াছেন; ইহা সুধু ধাক্কাধাক্কি করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াইত'? আমরা যদি অন্ততঃ তাঁহাদের ঠিক পিছু পিছুও প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও তাঁহারা এতটা হইতে পারিতেন না।" আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমি বলিলাম—"কেমন করিয়া?"

ইন্দু কৃত্রিম গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল—"কেমন করিয়া তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই? এমন সুদৃশ্য, চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সকলেই সাহিত্য-সেনাপতি হইতে পারে। দেখ

দেখি কেমন সুন্দর সুদৃশ্য—মস্তকোপরি কৃষ্ণমেঘের ক্রোড়ে শ্বেত-বিন্দুবৎ বক। নিম্নে মহা দুর্যোগে যমুনাবক্ষে বজ্‌রায়—।" ইন্দু আর বলিতে পারিল না, হাসিয়া ফেলিল। ননি একটু ক্রুদ্ধভাবেই চিৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে! এখন সাহিত্য বন্ধ ক'রে, প্রাণ বাঁচা। ঐ দেখ।"

আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম—ঝড় জল একত্রে মিলিয়া এই বিশ্বসংসারকে যেন গ্রাস করিতে প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রাণে একটু ভয়ের উদ্রেক হইল। কারণ আমাদের দেহরক্ষা করিবার মত নিকটে কোন আচ্ছাদন বা গৃহাদি ছিল না। কেল্লায় কিছুক্ষণের জন্য ব্যাণ্ড বাজিয়া থামিয়া গেল। সে প্রলয় বাদ্যে শরীর কাঁপাইয়া তুলিল। চিলের কর্কশ চিৎকারে চিত্ত চমকিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি যেন প্রলয়গর্ভে ডুবিয়া গেল। চতুর্দ্দিক জলে স্থলে একাকার হইয়া গেল। প্রবল ঝড়ে আমাদের ধাক্কা মারিল। অবিশ্রান্ত বারিপাতে আমাদের উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। আমরা এক পাও সরিয়া যাইবার অবকাশ পাইলাম না। এক স্থানে বসিয়া ভেজাটা নিতান্ত বোকামি স্থির করিয়া, তীরে লাফাইয়া পড়িয়া নিকটস্থ একটা সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিলাম। ইন্দুর ও আমার ছিপের সূতায় জড়াপটকা লাগিয়া গেল। ননির বাড়শি গিয়া লক্ষ্মীর সাটের হাতায় বিন্ধিয়া গেল।

[৪]

সুড়ঙ্গ মুখে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অগ্নিবিন্দুবৎ কি জ্বলিতেছে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গাভ্যন্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারগর্ভ হইতে কম্পিত কণ্ঠে কে যেন বলিল—"আইয়ে বাবুসাব, কুছ ডর নেহি।" প্রবল ঝড়জলে দেহ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া আমরা ভীত বিচলিত পদে সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। কিছুক্ষণ অন্ধের ন্যায় বসিয়া একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া দেখিলাম—এক বৃদ্ধ, তালিযুক্ত পায়জামা ও ছিন্ন মলিন কোট পরিধানে—অদূরে বসিয়া বিড়ির ধূমপান করিতেছে। নিকটে একটি মাছ ধরিবার ছিপ পড়িয়া আছে। বুঝিলাম—সেও আমাদের অবস্থা প্রাপ্ত একজন। বৃদ্ধ আমাদের জিজ্ঞাসা করিল—"আপ্ লোগন্ সব্ কাঁহাকো রহেনেওয়ালা হ্যায় বাবুদার্ ?"—আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম।

বাহিরে তখন প্রলয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিশ্বসংসার লণ্ডভণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রায় দশবারো মিনিটকাল নীরবে কাটিয়া গেল। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় কতক্ষণ অতিবাহিত করা যায় ? আমিও বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নে বৃদ্ধ যে প্রকাণ্ড একখানি উপন্যাসের সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিল তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বাবু, আমার কথা আর জিজ্ঞাসা কোরবেন না। আমার

জোনাকির আলো।

পরিচয় আমি—পাপী। আমি—ভিক্ষুক। আমার নাম—দীনমহম্মদ।
বাড়ী একদিন ছিল—লখনৌ। আর নাই! একদিন আমার
অনেক ছিল, কিন্তু এখন আমার কিছুই নাই। মা, বাপ, ভাই
বোনে আমার মস্ত সংসার ছিল। প্রকাণ্ড ইমারৎ। লখনৌয়ে
আমিনাবাদের আলি মাহম্মদকে চিনত না, তখন এমন কেহ ছিল
না। কিন্তু বাবু কি হ'লো? এক এক ক'রে সব চলে গেল।
আমি এমনই মহাপাপী—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। এই
বুকের উপর অনেক পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে গ্যাছে; কিন্তু
এখনও এ বুক টিকে আছে। এই চোখের সামনে আমাদের
রাজার বাড়ীর মত বাড়ীখানা দুস্‌মনের মিথ্যা মোকর্দ্দমায় নিলামে
বিকিয়ে গেল, তবুও এ চোখে বেশ দেখতে পাই। তারপর
একমাত্র পনর বৎসরের পুত্রকে নিয়ে হোসেনগঞ্জের এক ক্ষুদ্র
বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচে
রইলাম। কিছু দিন বেশ চলে গেল। পুত্র ডাগর হ'লো।
বিয়ে দিলাম। একটা নাতিনীও হ'লো। কিন্তু বাবু, এ একটু
খানি সুখও বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ভোগ কোরছিলাম।
সেবার লখনৌএ বিষম বর্ষা। সাতদিন সাতরাত অবিশ্রান্ত ঝড়
জল। গোমতীর জলপ্লাবনে সহর ভেসে যাবার উপক্রম হ'লো।
অনেক কোঠাবাড়ী ধ্বংসের মুখে চলে গেল। সেই সাতরাতের
এক এক রাতে—বাবু আমারও সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

উঃ বাবুগো! সে বজ্রাঘাতও মাথায় নিয়ে এখনও বেঁচে আছি!"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইল। সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিল। মুহূর্ত্তের ঈষদালোকে বুঝিতে পারিলাম না—বৃদ্ধের চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িতেছে কি না। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—

"সেই দুর্য্যোগের এক রাতে আমার নাত্‌নাটি বড়ই কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি বুকে কোরে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লাম! সে আমার বুকেই ঘুমিয়ে পড়লো। তখন রাত আন্দাজ আড়াইটে। কি একটা ভয়ঙ্কর শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ধড়ফড় করে উঠে বোসতেই একবারমাত্র কানে শুনলাম—"বাবা গো। তারপর সব চুপ্‌। সে কণ্ঠস্বর আমারই পুত্রের। ছুটে বেড়িয়ে কি দেখলাম? দেখলাম বাবু—আমার পুত্র ও পুত্রবধূ যে ঘরে ছিল সেই ঘরের ছাদ খসে পড়ে গ্যাছে। তারপর? আর ব'ল্‌তে পারবো না বাবু। তারপর আমার মান, ইজ্জত, জান—সবই সেই ছাদের নীচেয় চিরদিনের মত র'য়ে গেল। আমার নাত্‌নাটি আমারই বিছানায় ছিলো। তাকে বুকে চেপে ধোরলাম।

লখনৌয়ে আর তিষ্ঠিতে পারলাম না। তিন বৎসরের গুলজানকে বুকে ক'রে আমার আজন্ম পরিচিত লখনৌ ত্যাগ কোরলাম। তারপর এখানে এসে মুঠ্‌ঠিগঞ্জে এক খোলার ঘরে আশ্রয়

নিলাম। পাঁচ দুয়োর মেঙে দিন গুজরান ক'রে আরও পাঁচ বৎসর চলে গেল। এখন আমার গুলজান আট বৎসরের। বাবুগো, এই তো শুনলেন আমার পরিচয়। আমার একমাত্র পরিচয় আমি ভিক্ষুক। সকালে ভিক্ষা করি, বৈকালে মাছ ধরি। কিন্তু আজ বড়ই বিপদে পড়েছি বাবু। আমার গুলজান একলাটি কুঁড়েয় বসে না জানি কত কান্দছে।"

বৃদ্ধ বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া একটী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

[৫]

বৃদ্ধের দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমরা প্রায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ঘড়িতে দেখিলাম—প্রায় নয়টা। বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখনও ঝড় জল সম্পূর্ণ না থামিলেও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। সকলের অনুরোধে গান ধরিলাম—"তুমি হে—ভরসা মম"—ইত্যাদি।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় আমরা সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইলাম। বিদঘুটে অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোকে আমাদের সম্মুখে অধিক অন্ধকার ঘনাইয়া দিতে লাগিল। তখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝাপ্‌টা হাওয়ায় আমাদের পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা মারিতে লাগিল। ঠাণ্ডি-সরকে পৌঁছিয়া

দুইখানা একা করিলাম। বৃদ্ধকেও একার এক কোণে উঠাইয়া লইলাম। মুঠ্‌ঠিগঞ্জে বৃদ্ধের কুটির-দ্বারে একা দাঁড় করাইতেই বৃদ্ধ নামিয়া গেল, এবং "জেরা ঠারিয়ে বাবুসাব" বলিয়া মুহূর্ত্তে কুটীরে প্রবেশ করিয়া, এক নিদ্রিতা বালিকাকে বক্ষে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিল—"এহি মেরা জান বাবুসাব—এহি মেরা গুল্‌জান"—বলিয়াই বৃদ্ধ, বালিকার গণ্ডে বারম্বার চুম্বন করিল।

একার ক্ষীণালোকে দেখিলাম—ঠিক শুষ্ক ধূসর গোলাপের পাঁপড়ির মতই সে বালিকা। বৃদ্ধের হস্তে একটী টাকা দিয়া আমরা বলিলাম—"তোমার গুলজানকে দিলাম।"

ক্ষণকালের জন্য বৃদ্ধ আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—"আদাব বাবুসাব্।"

আমাদের একা ছুটিয়া চলিল। যখন বাসায় পৌঁছিলাম—তখন রাত্রি প্রায় এগারটা।

তারপর অনেক দিন বৃদ্ধের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছি—কিন্তু, বৃদ্ধ বা তাহার গুলজানকে আর দেখিতে পাই নাই।

বংশের ধন।

কালীচরণের বৃদ্ধা মাতা যখন গো-শালার সম্মুখস্থ কাঁটাল-বৃক্ষের ছায়ায় গো-দোহনে রত ছিল, এবং চারি বৎসরের বালক গোপাল বা গোপা শাখা-চ্যুত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অর্দ্ধশুষ্ক কাটাল-পত্র সংগ্রহ করিয়া গাভীর সম্মুখে ধরিতেছিল, দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে চতুর্দ্দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সকলি নিঝুম, কেবল গয়লা-ডাবার পানা-পচা জলে মধ্যে মধ্যে হংসশ্রেণী জাতীয় রব করিতেছিল; সেই সময় খড় বোঝাই একখানি গো-শকট মেটে রাস্তা ধরিয়া কালীচরণের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। গো-যানখানি এইরূপ ভাবে বোঝাই ছিল যে দেখিলে এক-খানি খোড়া ঘর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ভ্রম হইবে। গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল। এগাড়ীর গাড়োয়ান স্বয়ং কালীচরণ। বলদদ্বয়ের স্কন্ধের বোঝা নামাইয়া তাহাদের রসি ধরিয়া টানিতে টানিতে গো-শালায় প্রবেশ করিল। পথশ্রান্ত জীবদুটীকে আহার দিতে গিয়া ক্রোধে ও বিরক্তিতে কালীচরনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি খড়কাটা বঁটীখানা টানিয়া খড় কাটিতে বসিল। কালীচরণের মনে চিন্তা আসিল—"আমি এত খাটি কেন? কার জন্য! আমার কি, এ কার সংসার?

এই সাত ক্রোশ ঠেঙ্গিয়ে খড় নিয়ে এলাম—কোথায় একটু জিরুবো না আবার খড় কাটতে ব'সলাম! না, আর পারি না!' কালী-চরণের মনে হইতেছিল—যে খড়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারের সকল সম্বন্ধ-ও কাটিয়া ফেলে; কিন্তু আবার ভাবিল—'আমি যদি হাল ছাড়িয়া দিই তা'হলে যে নিমাই গয়লার সংসারটা ছারখার হয়। আমার অপরাধ আমি বড়!' কালীচরণ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা নেতাই ক'মনে?" মাতা দুধের কেঁড়ে হস্তে পাক-শালার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"কি জানি বাবা তার কথা আর ব'ল না"!

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শিজনা গ্রামে কালীচরণের বাস। তাহারা তিন ভাই। কালীচরণ জ্যেষ্ঠ, নিতাই মধ্যম এবং উমেশ কনিষ্ঠ। সংসারে কালীচরণের বন্ধ্যা স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতা এবং নিতাইয়ের স্ত্রী তরঙ্গিণী ও পুত্র গোপাল ভিন্ন আর কেহই ছিল না। উমেশ অবিবাহিত, কয়েক মাস ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য। কালীচরণের মৃত পিতার নাম—"নিমাই গয়লা।"

কালীচরণের সংসারে কিছুরই অভাব নাই, অভাব কেবল শান্তির। যে কারণে কত সংসারী সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে। ছোট বড় কত সংসার ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। একের অজ্ঞানতায় সংসারে আগুন জ্বলে, যে যার স্বার্থ টানিয়া সরিয়া পড়ে, পরিণামে ভাই ভাইকে জানে না, পুত্র পিতাকে

চেনে না। আজ নিমাই গয়লার সংসারে সেই আগুন জ্বলিয়াছে। নিতাইয়ের কুব্যবহারে সংসারে একটা অসহনীয় অশান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কালীচরণ সযত্নে একটি সুখের সংসার পাতিতে চাহে, নিতাই তাহার অন্তরায়। কালীচরণ মাথার ঘামে, যত্নের তুলিতে সংসারে একখানি শান্তিময়ী চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পায়, নিতাই তাহা অবজ্ঞার হস্তে মুছিয়া ফেলে। থাকে শুধু বৃদ্ধা মাতার বুকে একটা চিরস্থায়ী বিষম কাল দাগ।

কালীচরণ মাতার উত্তর শুনিয়া বলিল—"না বল্লে তো আর চলে না! আমি তো আর পারি না; সকালে তাকে বলে গেলাম যে, নেতাই, ছেনি ফুরিয়েছে, ছেনি কেটে রাখিস্,—এখন এসে দেখি এক মুটো ছেনি নেই। গরু দুটোকে দিই কি?" এমন সময় ঈষৎ মলিন, কাল-ফিতাপেড়ে বস্ত্র পরিধানে, বুকে ফুল দেওয়া লাল গেঞ্জিধারী নিতাই, শীসে কোন অনির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে করিতে আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা বলিল—"হাঁরে নেতাই! ছেনি কাটিস্ নি?"

নিতাই চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"তোর মাথাব্যথা পড়ে থাকে তুই কাট্‌গে যা, আমি তো কারও মাইনে খেগো চাকর নই যে হুকুম কর্ত্তে না কর্ত্তে তামিল হবে!"

মাতা পুত্রের বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া অগত্যা চুপ করিল। কালীচরণ একটু মৃদুস্বরে বলিল—"ভাই আমার চাকরি ক'রে

এলেন!" নিতাই উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল—"না, তুমি চাকরি ক'রে এলে?"

মাতা বেগতিক বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"নে ঠিক তুফুর বেলা ছুভেয়ে একটা কুরুক্ষ্যাত্তোর• বাধা, তোরা চুপ কর বাপু, আমি ছেনি কাট্‌ছি।"

নিতাই নিজের মনে বকিতে লাগিল —'দেখ দেখি, যা না তাই আমায় যেন কি পেয়ে ব'সেছে!'

মাতা—"তোরও তো বোঝা উচিত, একা কালী কোন্ দিক সামলায়!" নিতাইয়ের ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। মাতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—"বুঝবো কি? অসহ্য হয়, বল্লেই তো হয়—বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা! এত ভয় কিসের! পরের ছুয়োরে গতর খাটালে চাট্টে ভাত মিলবে না!"

কালী—"পরের ছুয়োরে না খাটিয়ে সেই গতরটা নিজের ছুয়োরে খাটা না! আর না হয় পরের ছুয়োরে কেমন সুখ একবার পরখ ক'রেই দেখ না!"

কালীচরণের শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে এবং মাতা কার্য্যতঃ দাদার পক্ষ সমর্থন করিতেছে দেখিয়া, নিতাই নিজেকে সে সংসারের সুখের পথে কণ্টক স্থির করিয়া আর বেশী কিছু বলিল না। কেবল—"বেশ তাই দেখবো" বলিয়া নিজকুটিরে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দোষ কাহার? কালীচরণের না—নিতাইয়ের? সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে সাংসারিক নানাকার্য্য শেষ করিয়া, শুষ্ক তালু হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালীচরণ যখন তাহার চির-প্রিয় দারিদ্র কুটীরের দিকে ছুটিয়া আইসে,—কানাই মণ্ডলের খামার বাড়ীর আম্রবৃক্ষের নিম্নে জীর্ণ মাদুরে বহু-হস্তবিমর্দ্দিত ময়লাযুক্ত তাস ফেলিয়া, নিতাই তখন স্বগৃহে প্রবেশ করে। সহরে ছানা বিক্রয় করিয়া বাঁক স্কন্ধে কালীচরণ যখন নিজ গৃহে আসিয়া পৌঁছায়, স'তে ময়রার দোকানে সারা বৈকালটা বহু পুরাতন, প্রকৃত শব্দহীন তবলায় কাওয়ালীর বোল সাধিয়া নিতাই তখন বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। কে বিচার করিবে—দোষ কাহার?

মাতা যখন দেখিল—নিতাই প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়,—তখন ব্যাকুলচিত্তে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল —"ওরে ফের, ফের! দুপুরবেলা না খেয়ে কোথাও যাস্‌নে"!

কালী—"ওরে হতভাগা, মায়ের কথা শোন্,—খেয়ে যা!" নিতাই কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। মাতা, ভ্রাতার অনুরোধ তাহার তখনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছাকে প্রবল করিল। সে মুহূর্ত্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

[২]

পাকশালা হইতে তরঙ্গিণী যে এই সমস্ত ভ্রাতৃকলহ শ্রবণ করিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল,—কারণ তাহার মসলা পেষণ-রত হস্তদ্বয় মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ কার্য্যবিরত হইতেছিল। গোপাল-যখন "ওমা আমার ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে চিৎকার করিতেছিল, তখন সে—"চুপ কর্" বলিয়া তাহাকে ধমকাইতেছিল। তারপর নিতাই যে মুহূর্ত্তে গৃহ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—পরক্ষণেই তরঙ্গিণীর হস্ত হইতে দুধের কেঁড়েটি পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অপ্রস্তুত হইয়া তরঙ্গিণী গোপালের পৃষ্ঠে কিছু ঝাল ঝাড়িয়া লইয়া ক্রন্দনস্বরে বলিল—"পোড়া বিষের জ্বালায় ম'লাম! বিষ যাবে কবে?"

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু নিতাই গৃহে ফিরিল না। কালীচরণ মনকে বুঝাইল—'কোথায় যাবে! ছেলেমানুষ ত' নয়! এল বলে!' কিন্তু মায়ের প্রাণ সে বুঝ মানিল না। বৃদ্ধা ভীত হইয়া পুত্রকে বলিল—"ও কালী একি হ'ল? রাত হ'ল, কৈ নিতাইতো এল না? সে ত এমন রাগ কখনও ক'রে না!" কালীচরণ একবার ও পাড়া অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল—"ও মা শুনেছ,—নিতাই নাকি চাকুরি খুঁজিতে বর্দ্ধমান গিয়েছে।"

সারা রাত্র বৃদ্ধা মাতার ভাল নিদ্রা হইল না! নিতাইয়ের গৃহপার্শ্বস্থ প্রতি ক্ষুদ্র শব্দটী নিতাইয়ের পদশব্দ বলিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জাগিতে লাগিল। রাত্র শেষে নিতাইয়ের গৃহে কি একটা শব্দ হওয়ায় বৃদ্ধা চমকিত হইয়া, তৈলসিক্ত উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল—"কে, নিতাই এলি কি?"—কোন উত্তর না পাইয়া, বৃদ্ধা শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ দিবালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিতাইয়ের গৃহদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দেখিয়া স্থির করিল, —নিতাই নিশ্চয়ই আসিয়াছে। মাত্র একদিন নিতাইকে না দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধার মনে হইতেছিল—'আহা, নিতাইকে আজ কতকাল দেখিনি'—তাই মায়ের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে নিতাইয়ের গৃহে প্রবেশ করিল; —কিন্তু গৃহশূন্য। নিতাই, তরঙ্গিণী বা গোপাল কেহই নাই। বৃদ্ধার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাতি পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিল,—কিন্তু বৃথা। অবশেষে কালাচরণের গৃহের দাওয়ায় লুঠাইয়া পড়িয়া ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"ও কালী শীঘ্র ওট্, দেখ মেজেবৌও বুঝি আমার গোপালকে নিয়ে কোথায় চলে গেল।"

পর দিবস গ্রামে ভয়ানক একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল।

সন্দেহজনক স্থান সমূহে লোক পাঠান হইল, কিন্তু তরঙ্গিণী ও গোপালের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না!

বৃদ্ধা, নিতাই ও তরঙ্গিণীকে ভুলিয়া গোপাল বলিয়া পাগলিনীর মত হইল। যে গোপাল সারা দিবস তার অঞ্চল ধরিয়া পায়ে পায়ে ফিরিত, সংসারের এক মাত্র সোহাগ ও স্নেহের জিনিস, একাই শত হইয়া বৃদ্ধার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইত, হাসি কান্না ও কলরবে নিমাই গয়লার ক্ষুদ্র সংসারটীকে অষ্টপ্রহর মুখরিত করিয়া রাখিত,—সে গোপাল আজ কোথায়!

এক দুই করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। গোপালের অপরিহার্য্য স্মৃতির অসহ্য যন্ত্রণায় বৃদ্ধার জীর্ণদেহ দিন দিন আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল। একদিন পাক-শালার দাওয়ায় বসিয়া চক্ষে বস্ত্র চাপিয়া, বৃদ্ধা যখন গোপালের নাম করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া অনুচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল,—কালীচরণ তখন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সংসারের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। মাতার ক্রন্দনের সুর তাহার বক্ষে গিয়া আঘাত করিল। তাহারও গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করিয়া বলিল— "বাবা, আজ তুমি কোথায়! একবার দেখে যাও—তোমার সংসারে আজ কত সুখ!"

তার পর প্রায় দেড় বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিতাই,

তরঙ্গিণী বা গোপাল, কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

[৩]

গাড়ী আসিবার সময় হওয়ায়, গেট্‌ম্যান্,—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক—রোডের ফটক্ বন্ধ করিয়া, সবুজ রঙ্গের ঝাণ্ডি হস্তে তাহার রেলকোম্পানি দত্ত ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুটীরাভ্যন্তর হইতে একটি বালক আসিয়া বলিল—"বাবা, আমি নিশেন ধরবো!" বাবা উত্তর করিল—"না।" হাওড়া ষ্টেসন্ লক্ষ্য করিয়া ট্রেনখানি ছুটিতেছিল, সর্ব্ব-পশ্চাতে দুইখানি ছানার-গাড়ী, (curd-van) সংযুক্ত ছিল। ছানার গাড়ীর আরোহিগণের মধ্যে, ছানার বাজার-দর সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। কেহ বা অঞ্জলি মধ্যে কলিকা আবদ্ধ করিয়া এক মনে ধূমপান করিতেছিল। যে মুহূর্ত্তে ট্রেন্‌খানি ফটক্ অতিক্রম করিল,—ঠিক সেই সময় গেট্-ম্যান্ পার্শ্বস্থ বালকটী দুইহস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ও গয়লা ছ্যানা-দেনা!' ছানার গাড়ীর আরোহিগণ কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। কেবল একব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কালীচরণ গাড়ীর পার্শ্বে ঝুঁকিয়া আর একবার বালকটীকে দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আর দেখিতে পাইল না,—গাড়ী তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে। কালীচরণের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জাগিল—

"আহা ছেলেটী ঠিক গোপালের মত!"

গাড়ী চলিয়া গেল, গেট্‌ম্যান্ ফটক খুলিয়া দিয়া, দড়ির খাটিয়ায় আসিয়া উপবেশন করিল।

রেল-কোম্পানি প্রদত্ত ইষ্টকনির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠটীতে গেট্‌-ম্যান তাহার ক্ষুদ্র সংসারটী বেশ গুছাইয়া পাতিয়া লইয়াছে। কোন কিছুরই ত্রুটি নাই। এমন কি কুটীরপার্শ্বে মাচাঙ্গে লাউ কুমড়া পর্য্যন্ত ফলিয়াছে। কিন্তু সংসারটী নূতন হইলেও বহু পুরাতন। ইহা নিমাই গয়লার সংসারের স্থানচ্যুত এক টুকরা। এ সংসারের গৃহিণী তরঙ্গিণী, স্বামী নিতাই। নিতাই গেট্‌ম্যান সাজিয়া নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যস্থ রেলকোম্পানির অল্পায়তন কক্ষে স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার পাতিয়া নিজেকে বড়ই সুখী জ্ঞান করিতেছে, কিন্তু—দশের চক্ষে নিতাই বড়ই দুঃখী।

রাত্র আন্দাজ দশটা। আকাশে বেশ মেঘ জমিয়াছে। যদিও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তথাপি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের লাল ধূলা সম্পূর্ণ মরে নাই। মাঝে মাঝে একটা একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। নিতাই স্ত্রী-পুত্রসহ তাহার ক্ষুদ্র কুটীর-টীতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা ভগ্ন হইল এবং পশ্চিমে বহু দূরে সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। বালকের মনে যুবকের সাহস সঞ্চারিত হইল। গোপাল পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে

গিয়া ইঞ্জিনসম্মুখস্থ আলোক তিনটী দেখিয়া বেশ বুঝিল—গাড়ী আসিতেছে। পিতার ন্যায় ঝাণ্ডি হস্তে বেগবান-গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইবার প্রবল ইচ্ছা গোপালের তরল মনে সজোরে আঘাত করিল। সে গৃহ-কোণ হইতে সবুজ নিশানটী বাছিয়া লইয়া উন্মুক্ত আঁধারে মিশিয়া গেল।

গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে, নিতাইয়ের কুটীর কাঁপাইয়া ঝড়বেগে একখানা মালগাড়ী সে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সেই শব্দে নিতাইয়ের ও তরঙ্গিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিল। গৃহে গোপাল নাই দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া—"গোপাল, গোপাল!" করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল—আকাশ মেঘাছন্ন। 'অন্ধকারে নিজকেই দেখা যাইতেছে না। নিতাইয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীত-কম্পিত-স্বরে চিৎকার করিয়া গোপালকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। কেবল—রেল-রাস্তাপার্শ্বস্থ জলাশয়ে ভেকের অবিশ্রান্ত রব ও জলমধ্যে প্রোথিত টেলিগ্রাফের তারের স্তম্ভোত্থিত একরূপ অবিরাম শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। গোপালের কোন সারা না পাইয়া নিতাই অগত্যা রেল-কোম্পানির একমুখো লণ্ঠন লইয়া তাহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে বাহির হইল। তরঙ্গিণী কম্পিত হৃদয়ে কুটীরদ্বারে বসিয়া গোপালের জন্য মা কালীর নিকট মানত করিতে লাগিল।

[৪]

শেষ রাত্রে আকাশ অনেকটা মেঘমুক্ত হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি চন্দ্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। অস্পষ্ট চন্দ্র-কিরণ বৃক্ষ-শাখার ফাঁক দিয়া আসিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল—মধ্যে মধ্যে দামোদর পাড়ের, কোন গ্রামের বারোয়ারি পূজার যাত্রা-গানের সুর বহন করিয়া, ঝাউ বৃক্ষের মস্তক কাঁপাইয়া, আম্রের মুকুল দোলাইয়া একটা একটা মৃদু হাওয়া বহিয়া যাইতেছে;—এমন সময় এক যুবক, স্কন্ধে বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন গুরুভার বহন করিয়া, শিজ্‌লা গ্রামের রাস্তা ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। একটী স্ত্রীলোকও মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

ক্রমে যুবক কালীচরণের বাটীর সন্নিকটস্থ হইল। কিন্তু বাটীতে প্রবেশ করিতে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। যে স্থানে যুবক তাহার মধুর বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, সংসারে যদি কিছু আপনার থাকে-তো সেই স্থানে। যে স্থান কত আপনার,—সেই স্থানে যুবক চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিল—"দাদা!"—কালীচরণ জাগ্রত ছিল। চমকিত হইয়া উত্তর দিল—"কে!"

যুবক—"আমি, দাদা।"

কালীচরণ—"এ্যাঁ, কে নিতাই নাকিরে?"

যুবক—"হ্যাঁ দাদা, সেই হতভাগা!"

কালীচরণ আলোক হস্তে দৌড়াইয়া বাহির হইল। অপর গৃহ হইতে বৃদ্ধা মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইল। কালীচরণ বাহির হইবামাত্র নিতাই তাহার পদতলে পড়িয়া উন্মাদের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—"ক্ষমা কর দাদা! তোমার মনে কষ্ট দিয়ে, হাতে হাতে তার সাজা পেয়েছি"—কালীচরণ ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বলিল—"ও নিতাই—তোর মনে এই ছিল!" তরঙ্গিণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ্যাঁ, এই যে মেজবোমা! কই আমার গোপাল কই?"

নিতাই ক্রন্দন-স্বরে বলিল—"আর কেন মা, এ জনমের মত গোপালকে ভুলে যাও—গোপাল আমাদের ছেড়েছে!"—নিতাই আঙ্গিনায় যেস্থানে তাহার স্কন্ধের বস্ত্রাচ্ছাদিত বোঝা নামাইয়াছিল,—সেই স্থানে দৌড়িয়া গিয়া তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিল—"এই দেখ মা তোমার সাধের গোপাল!" বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে—"একি দেখালি নিতাই!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাইতো, একি? গোপালের মস্তক দেহচ্যুত, হস্তপদ ছিন্ন ভিন্ন। কালীচরণ তদ্দর্শনে হতজ্ঞান হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এ কে কল্লে নিতাই?"

নিতাই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল—"রেল গাড়ীই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে।" তোমাদের উপর টেক্কা মেরে চাকুরি কর্ত্তে গিয়েছিলাম। পরের প্রাণ বাঁচাবার ভার নিয়ে, নিজের প্রাণ খুইয়ে, আজ আমার এই চাক্‌রির-ধন নিয়ে ফিরে এইছি। মুখ ফিরিও না দাদা, হাত পেতে তুলে নাও।" কালীচরণ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল—"এ কি কল্লি নিতাই! গোপাল যে আমাদের একমাত্র 'বংশের ধন' ভাই!"—কালীচরণ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

আকাঙ্ক্ষিত মিলন সুখের পরিবর্ত্তে—নিমাই গয়লার সংসারে দারুণ শোকোচ্ছ্বসিত একটী প্রবল-বন্যা বহিয়া, কয়েকটী সংসারীকে অগাধ দুঃখসলিলে নিমজ্জিত করিল।

অধমের উত্তম।

[১]

টেষ্ট্ পরীক্ষায় ভোলানাথ 'এলাউ' হইল না। অগত্যা বাক্স বিছানা গুটাইয়া, সহরের বোর্ডিং হইতে চিরবিদায় লইয়া সে দেশে ফিরিয়া গেল। সহরের স্কুলটীম্ একটা বেষ্টহাপ্ ব্যাক্প্লেয়ার হারাইল।

ভোলানাথ পিতার একমাত্র পুত্র বা ভিক্ষার ঝুলি। পল্লী-গ্রামে বাস। সাংসারে পিতামাতা ভিন্ন অন্য কেহই নাই। অবস্থা তত ভাল নহে। সামান্য দুইচারিখানি জমি জমা আছে—তাহারই কল্যাণে অনাহারে থাকিতে হয় না। পিতা মাতা মুখের গ্রাস বিক্রয় করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া এক-মাত্র বংশের দুলালকে সহরের বোর্ডিংএ রাখিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করাইতেছিলেন। এক্ষণে সেই একমাত্র আশা ভরসার কেন্দ্র—পুত্র, বিদ্যার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন পথের দ্বার উদঘাটিত করিয়া আঁধারে থমকিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া পিতা হতাশে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মাতা পোষিত বাসনায় জলাঞ্জলি দিলেন।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে যেমন দুই শ্রেণীর অকর্ম্মা লোক থাকে,

—ভোলানাথের গ্রামেও তাহা ছিল না এমন নহে। নবীন ভট্টচাজ্জির বৈঠকখানায়—পাশাখেলা, তামাক খাওয়া, রাজা বাদসা মারা, বকুল গাছের গোড়া বান্ধা শানে বসিয়া মুখের তোড়ে কেল্লাফতে করা,—পরনিন্দা পরচর্চা, একঘরে করা, মধ্যে মধ্যে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া কালী করুণাময়ীর নাম স্মরণ করা যে সকল নিষ্কর্ম্মার কাজ,—সেই শ্রেণীকে "মুরুব্বির দল" কহে। এবং মতি ঘোষের খামারবাড়ীতে,—বিড়ি সিগারেট্, তামাক সিদ্ধি, তাস দাবা,—রিড্ ভাঙ্গা হারমনিয়ম্, বোবা ডুগি তবলা, টপ্পা টিপ্পনী, কুচিন্তা, বিশ্রী আলাপ, দুরভিসন্ধি, বাজে এয়ারকি, —মধ্যে মধ্যে অতীত জীবনের সামান্য বিস্তার বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক,—এই সমস্ত লইয়া যে শ্রেণী অকর্ম্মণ্য জীবন অতিবাহিত করে, মুরুব্বির দল তাহকে "ছোকরার দল" কহে।

ভোলানাথ প্রথমতঃ গ্রামে একটি "ফুটবল-টীম" খুলিবার মনস্থ করিল। কিন্তু খেলোয়াড়ের বিশেষ অভাব দেখিয়া তাহাকে সে মতলব পরিত্যাগ করিতে হইল।

বছরখানেকের মধ্যে ভোলানাথ ছোকরার দলে ভিড়িয়া গেল। সে বেশ একটু গাহিতে পারিত। অল্পদিনের মধ্যেই আড্ডায় বেশ খ্যাতিলাভ করিয়া ভোলানাথ 'ওস্তাদজী' উপাধি প্রাপ্ত হইল। ওস্তাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন ছোকরার দল উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিনের মধ্যে চরম উন্নতি লাভ

করিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে "ফিষ্টের" দিনগুলি সিদ্ধি ভাংয়েই যথেষ্ট মস্‌গুল হইত। কিন্তু একদিন দেখা গেল—ফিষ্টের রাত্রির প্রান্তে ছোকরার দল তাহাদের আড্ডায় যুদ্ধক্ষেত্রের নিহত সৈন্যের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এবং বিশেষ কোন পানীয়ের গন্ধযুক্ত দুই চারিটী শূন্য আধার গড়াগড়ি যাইতেছে। কথাটা ভোলানাথের পিতামাতার কাণে পৌঁছাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—"গিন্নি, এ পুত্র হ'তে আমাদের অনেক সহ্য কোরতে হবে। অনেক শুনতে হবে। এখনও হ'য়েছে কি? এইত সবে সুরু।"

"তা এই বেলা ওকে কোন আফিসে চেষ্টাবেষ্টা ক'রে দাও না। বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা বসে থাকলেই দিন দিন ব'য়ে যাবে।"

"আফিসওয়ালারা ঠিক বয়স্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নয় গিন্নি, —যে কুলীন দেখে অকালকুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গারের করেও কন্যাদান কোরতে কুণ্ঠা বোধ কোরবে না। চাকরিগুলো ঠিক কুলীনের জন্য নয়। তা হলে না হয় ঘটক পাঠিয়ে চেষ্টা করতুম। কোথায় ওর জন্য চাকরির চেষ্টা কোরতে যাবো? যা হয় করুগ। আমরা আর ক'দিন।"

কিছুদিন পরে মুরুব্বি মহলে মহলে একটা মস্ত আন্দোলন উপস্থিত হইল,—পরাণ মুখুজ্জের ছেলেটা নাকি যদু ঘোষের

মেজমেয়েটাকে কি ঠাট্টা মস্করা কোরেছে। তাই নিয়ে এক কেলেঙ্কারী। যদু ঘোষের সেই গোঁয়ার ছেলেটা নাকি ভোলাকে খুন কোরবে বোলে শাসিয়েছে। অমন সাধুলোক পরাণ মুখুজ্জে —দেবতার অংশ বোল্লেও হয়—সেই লোকের কিনা অমন কুলাঙ্গার পুত্র। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমাদের কি হাত!—ইত্যাদি।

ভোলানাথের পিতা পরাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের গুণ-কীর্ত্তন শুনিয়া মৃতপ্রায় হইলেন। লজ্জায় ঘৃণায় গৃহের বাহির হওয়া একরূপ বন্ধ করিয়া দিলেন।

কর্ত্তা গৃহিণীর উপর কড়া হুকুম দিলেন—ভোলানাথ যেন আর তাঁহার গৃহে প্রবেশ না করে। তাহার জন্য কর্ত্তার মুখে চুণকালি পড়িয়াছে। তিনি এ সব আর বরদাস্ত করিতে পারিবেন না।

দুই একদিন ভোলানাথ সাধারণের দৃষ্টি হইতে নিজকে লুকা-ইয়া রাখিবার জন্য গা-ঢাকা দিয়া বেড়াইল।

একদিন নির্জ্জনে পাইয়া মাতাঠাকুরাণী ভোলানাথের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে বলিলেন—"বাবা, এই টাকা নিয়ে তুই আজই ক'লকাতা যা। গিয়ে তোর মেসোমশার বাসায় উঠ্‌বি। সেখানে দু'চার দিন থেকে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা কোরে দেখ্। আমায় আর জ্বালাস্‌নে। বড় হইছিস্—এখন আমাদের কষ্ট বুঝবি, না—আরও কষ্ট দিচ্ছিস্। কর্ত্তা তোর

উপর বড্ড চোটেছেন। তোর জন্মেই আমার যত জ্বালা। নইলে আমার কি!"

নতমস্তকে ভোলানাথ মাতার কথাগুলি শুনিল। পরদিন তাহাকে আর গ্রামে দেখা গেল না।

[২]

কলিকাতায় পৌঁছাইয়া চাকুরির সন্ধান করা দূরের কথা, ভোলানাথ প্রথম কয়েক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া চিড়িয়াখানা, ইডেন-গার্ডেন, পরেশনাথের বাড়ী, মিউজিয়ম ইত্যাদি কলিকাতার নাম-জাদা জিনিসগুলি দেখিয়া লইল। এক রাত্র থিয়েটারও দেখিল। তাহার পর চাকরির চেষ্টায় বাহির হইতে আরম্ভ করিল। চাকুরি মিলিল না। ভোলানাথ দেশে ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল। কিন্তু কলিকাতার কোন্ প্রলোভনে, কোন্ মোহিনী শক্তিতে জানি না—ভোলানাথকে সেই আজবসহরের বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার চিন্তায় সে ম্রিয়মাণ হইল।

শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ভোলানাথ আরও দিন তিনেক থাকিয়া যাইবার মনস্থ করিল। উপর্য্যুপরি তিন দিন ক্লাইভ ও ক্যানিং ষ্ট্রীট্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকবার মাটির বাটীতে দুই পয়সার সরবৎ পান করিয়া, এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানির আফিসে ২৫৲ বেতনের একটি কর্ম্ম পাইয়া ভোলানাথ কৃতার্থ হইল। বাসায় ফিরিয়াই মাকে সংবাদ পাঠাইল। মাতাঠাকুরাণী আকাশের

চাঁদ হাতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"বাবা, তোমার চাকরি হইয়াছে জানিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। বেশী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইও না। ওখানে যেরূপ খানাতল্লাস ও চুরি ডাকাইতি হইতেছে—আমার বড়ই ভয় হয়। আমাদের জন্য ভাবিও না।"

গম্ভীরভাবে কর্ত্তা বলিলেন—"চাকরি হোলো বটে গিন্নি,—কিন্তু এ অধঃপতনের সোজা পথে গিয়ে দাঁড়াল। ক'ল্‌কাতার মত জায়গা। চারিদিকে আকর্ষণ, আশে-পাশে প্রলোভন, তাতে তোমার ভুলুর মত ছেলে। হাতেও দু চারটে টাকা যাতায়াত কোরবে। তবে যাক্—যা হয় দূরে দূরেই হবে। বেশী কিছু কাণে আসবে না।"

ভোলানাথ বেশ মনোযোগের সহিতই চাকরি করিতে লাগিল। প্রথম মাসকয়েক নিজের পোষাক পরিচ্ছদগুলি মনোনীত করিয়া গুছাইয়া লইল এবং মেসোমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া একটি অফিসার্স মেসে আড্ডা লইল। কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল।

[৩]

আজ কাল নাকি কোন কোন দিন গভীর রাত্রে রামবাগানের বিশেষ কোন বাড়ী হইতে ভোলানাথকে বাহির হইতে দেখা যায়। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে—ভোলানাথ ধীরে ধীরে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ব্যঙ্গস্বরে কর্ত্তা একদিন গিন্নীকে বলিলেন—"কিগো, তোমার ভুলু কেমন চাকরি বাকরি কোরছে? ক'কুড়ি ক'রে মাইনে পাচ্ছে? খবর-টবর কিছু পাও?"

কথাটা গৃহিণীর বুকে বড়ই বাজিল। তিনি কোন জবাব দিলেন না।

কর্ত্তা পুনরায় বলিলেন—"আমি যা বোলেছিলাম, ঠিক তাই কিনা, গোপনে খপর নিয়ে দেখ, তোমার ভুলু অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়ে পৌচেছে—এ নিশ্চয়ই।" গৃহিণী নীরব রহিলেন।

[৪]

এই মাত্র একখানি পত্র পাইয়া ভোলানাথ একাগ্রমনে পাঠ করিতেছে—"বাবা ভুলু,—আজ ছয় মাস হইতে চলিল তোমায় দেখি না। তোমাকে একবার দেখিবার জন্য মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অতি অবশ্য অবশ্য একবার বাড়ী আসিবে। বাবা! আমাদের কথা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি ভুলিতে পার, কিন্তু আমরা ভুলিতে পারি না। পিতামাতার যে কতখানি আশা-ভরসা বুকে করিয়া পুত্রের মুখ চাহিয়া থাকে, তাহা পুত্রে বোঝে না। তাহা যদি বুঝিত তবে আর দুঃখ কি? যাহা হউক, তোমাকে অবশ্য লেখা উচিত না। তবে না লিখিয়াই বা উপায় কই। তুমি আজ ছয় মাস চাকরি করিতেছ, কিন্তু কি চাকরি, কত বেতন পাও সে সব কিছুই জানি না। বাবা, তুমি আর ত'

ছেলেমানুষ নও। তোমায় বলিব না ত' আর কাহাকে বলিব! সংসারের অবস্থা ত' জান। কোন রকমে দিন চলিয়া যায়। কিন্তু, এ বৎসর বুঝি আর চলিবে না। দেশে অজন্মা হইয়াছে। যাহা দু-একখানি জমি আছে, তাহাতে এবার অর্দ্ধেক ফসলও হয় নাই। তারপর আর একটা কথা তুমি জান না। ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে জানাইবার আবশ্যক মনে করি নাই বলিয়া, জানান হয় নাই। তুমি যে সময় পড়িতে, সেই সময়কার একটা দেনা আছে, তাহা আজও শোধ হয় নাই। সুধে আসলে প্রায় তিন শত টাকা হইবে। শুনিতেছি এবার সে টাকা না দিতে পারিলে আমাদের নামে নালিশ হইবে। কি হবে বাবা? ভাবনায় আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে। তাই লিখি—যদি পার, মাসে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এখানে পাঠাইয়া দিবে, অথবা নিজের কাছে জমাইয়া রাখিবে। অধিক আর কি লিখিব। উপস্থিত দুইটি টাকা পাঠাইবে—তোমার কল্যাণে ৺সত্যনারায়ণদেবের পূজা দিব। একবার বাড়ী আসিবে।" ইতি—তোমার মাতা।

পত্র পাঠ করিয়া ভোলানাথ কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকিল, তারপর জবাব লিখিল—

"মা! আপনার পত্র পাঠে বিস্তারিত অবগত হইলাম। মা! আমি বাড়ী যাই না বলিয়া আপনি দুঃখ করিয়া লিখি-

য়াছেন যে—আমি আপনাদের ভুলিয়া গিয়াছি। আমি ত' আর স্বাধীন নই মা, যে যখন তখন বাড়ী যাইব? ছুটি পাইলে নিশ্চয়ই বাড়ী যাইব। আপনার লিখিত মত কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অদ্য দুই টাকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। আমি ২৫৲ পঁচিশ টাকা করিয়া বেতন পাই। আপনাদের কুশলে সুখী করিবেন, ইতি।"

পত্র ও টাকা পাইয়া মাতা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন ও কর্ত্তার হস্তে পত্রখানি দিলেন। কর্ত্তা পত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সন্তোষলাভ করিলেন।

সেই মাসের বেতন হইতে পাঁচ টাকা জমা দিয়া ভোলানাথ সেভিংব্যাঙ্কের একটি একাউণ্ট খুলিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—প্রতি মাসেই বেতন হইতে পাঁচ টাকা করিয়া জমা দিবে।

[৫]

তাহার পর আরও অনেকদিন চলিয়া গেল। কিন্তু ভোলানাথ বাড়ী আসিল না। মাতাঠাকুরাণী পত্র লিখিলেন—"বাবা ভুলু, বহুকাল যে তোমার মুখখানি দেখি না। একবার ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবে। এ দিকে এক বিপদ। সেই দেনার টাকার পাওনাদার আমাদের নামে ৪০০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে। মোকর্দ্দমা চলিতেছে। ক্ষিতিবন্দীর প্রস্তাব করা

হইয়াছে। কি হইবে—ভগবান্ জানেন। এ সময় একবার বাড়ী আসিবে।”

পত্র পাঠ করিয়া ভোলানাথের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

পাওনাদার ৪০০৲ টাকার ডিক্রি পাইল। ভোলানাথের পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সোমবার প্রাতে আদালতের পেয়াদা সঙ্গে লইয়া পাওনাদার ভোলানাথদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই ক্রোক দিতে আসিল। গ্রামে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল—ব্যাপার কি? গৃহিণী ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাওনাদারের পক্ষ হইতে থালা বাটি সিন্দুক পেটরা ইত্যাদি গৃহের তৈজস পত্র লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। কর্ত্তা এক পার্শ্বে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় একটা ব্যাগ হাতে করিয়া লোক ঠেলিয়া ভোলানাথ বাটীতে প্রবেশ করিল ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—“বাহিরে যাও সব। কত টাকার ডিক্রি বল—টাকা গুণে নিয়ে আস্তে আস্তে খসে পড়ো।”

ব্যাগ্ হইতে নোটেতে টাকাতে ৪০০৲ টাকা বাহির করিয়া ভোলানাথ পাওনাদারের হাতে দিল। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। গ্রামশুদ্ধ লোকে শত মুখে ভোলা-

নাথের প্রশংসা করিতে লাগিল। হ্যাঁ উপযুক্ত পুত্র বটে। পিতা আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ভোলানাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাতা বক্ষে টানিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন।

রাত্রিতে পিতাপুত্র আহারে বসিলে গৃহিণী কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কেমন? বড় না একদিন ঠাট্টা কোরেছিলে? এখন দেখলে তো আমার কেমন ছেলে?"

কর্ত্তা ভাতের গ্রাস হাতে লইয়া বলিলেন—"হঁ্যা দেখলাম। এই বুদ্ধিটা যদি গোড়া থেকে হ'তো, তাহ'লে বড় সুখের হোতো আর কি!"

গৃহিণী সোৎসাহে বলিলেন—"এইবার আমার ভুলুর একটা সম্বন্ধ দেখ। আর কতদিন একলা থাকবো?"

কর্ত্তা আহার শেষ করিয়া বলিলেন—"বিয়ের জন্য কি? মুখের কথা ফেলতে যত দেরি।"

ভোলানাথ নতমস্তকে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। মাতা বলিলেন—"ছেলের আমার খাওয়ার শ্রী দেখ। কাগের ঠোঁটের এক ঠোট। সেই জন্যে শরীরও হ'য়েছে আধখানা!"

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই ভোলানাথ মাতাকে বলিল—"বিশেষ দরকারে মামাবাড়ী চল্লুম। পরশু ফিরে আসবো।"

"সে কিরে,—কতকাল পরে বাড়ী এলি, আবার আজই মামাবাড়ী যাবি?"

"না মা আজই যেতে হবে। পরশু আমাকে ফিরতেই হবে।"

অগত্যা পিতামাতা সম্মতি দিলেন। কিন্তু এক দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ চলিয়া গেল—ভোলানাথ,মামাবাড়ী হইতে ফিরিল না।

একদিন বৈকালে ভোলানাথের বাড়ী লাল পাগড়ীতে ঘিরিয়া ফেলিল। ভয়-কম্পিতপদে কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি দারগাবাবু ?"

বুটের মাথায় বেতের টক্কর মারিতে মারিতে দারগাবাবু বলিলেন—"বিশেষ কিছু না। আপনার বাড়ী একবার খানাতল্লাস কোরবো।"

"কেন বলুন দিকি ?"

"উপরওয়ালার হুকুম।"

"হুকুমের একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই ?"

"অবশ্যই আছে।"

"সেটা শুনতে পারি নাকি ?"

"পাবেন বৈকি, তবে আজ নয়! পরে।"

কর্ত্তা অগত্যা গৃহিনীকে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

এ খানাতল্লাসের কারণ কর্ত্তা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার পুত্র হইতেই যে এ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনি সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন। এই স্বদেশী হুজুকের দিনে ভোলানাথ যে নিশ্চয়ই একটা কিছু

করিয়া বসিয়াছে এবং সেই কারণেই সে বাড়ী আসিয়াই মামার বাড়ী পলায়ন করিয়াছে তাহাও কর্ত্তার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

খানাতল্লাসে কিছুই মিলিল না। দারোগাবাবু নিরাশ হইয়া সপল্টন প্রস্থান করিলেন।

[৬]

ভোলানাথের কোন সংবাদ না পাইয়া কর্ত্তা গৃহিণী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহিণীর কাতর অনুরোধে কর্ত্তা বাধ্য হইয়া স্বয়ং ভোলানাথের খোঁজ লইতে বাহির হইবেন—মনস্থ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎপূর্ব্বেই ভোলানাথের মাতুলালয় হইতে সংবাদ আসিল—"গতকল্য পুলিশে ভোলানাথকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা লইয়া গিয়াছে।"

সংবাদ শুনিয়া গৃহিণী সরোদনে শয্যা লইলেন। কর্ত্তার চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীটা যেন ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। আর বুঝি উঠিবে না।

নিরীহ কর্ত্তা ভোলানাথের মুক্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। কোন্ অপরাধে আজ ভোলানাথ রাজ-দ্বারে বন্দী—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতেই আবার সংবাদ আসিল—"ভোলানাথের দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।"

গৃহিণী শয্যা লইয়াছিলেন—আর উঠিলেন না। পুত্র-শোকেই তনুত্যাগ করিলেন।

কর্ত্তা তখনও ভোলানাথের কারাদণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

একদিন কর্ত্তা শূন্য-গৃহে বসিয়া, জন্ম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভোলানাথের জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গুলিও একবার স্মরণ করিতেছিলেন। বাৎসল্যস্নেহের তীব্র মধুর আঁচে তাঁহার কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল,—এমন সময় ডাকপিয়ন একখানা পত্র তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিল। পত্র লিখিতেছে জেল হইতে ভোলানাথ,—

"বাবা,—আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে—আমি একদিনের জন্যও আপনাদের সুখী করিতে পারিব না। উপরন্তু আমার জন্য আপনাকে সাধারণের নিকট অনেক খাট' হইতে হইয়াছে। যাহা ভাল বুঝিয়াছিলাম—তাহাই করিয়া ফেলিয়াছি। তবে সারাজীবন বসিয়া চিন্তা করিলেও ঠিক মীমাংসা করিতে পারিব না, বাস্তবিক সেটা ভাল কি মন্দ। যাহা হউক আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার বড় রক্তামাশয় হইয়াছে। অতি কষ্টে পত্র খানি লিখিলাম। মাতাঠাকুরাণী ও আপনি কেমন আছেন? ইতি আপনার অধম পুত্র,—ভুলু।"

পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু অতি কষ্টে রোধ করিয়া কর্ত্তা পত্রখানি বারম্বার পাঠ করিলেন। কিন্তু তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিলেন না। পুনরায় পাঠ করিলেন।

কি সে কোরেছে,—যার জন্য সে ক্ষমা চেয়েছে? কিসের মীমাংসা সে সারা জীবনেও কোর্ত্তে পারবে না? এ যে বড় জটিল রহস্য। কর্ত্তা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—এমন সময় এক বৃদ্ধ হাতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ছেলেটার কি কুবুদ্ধি হে,—খবরটা জেনেছ বোধ হয়? এই দেখ। আমি একটু চাটুয্যের ওখান থেকে আসি।" কাগজখানাকে কর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া আগন্তুক প্রস্থান করিলেন।

স্পন্দিত হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে কাগজখানা লইয়া কর্ত্তা পড়িতে লাগিলেন—"কিছুদিন পূর্ব্বে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নামে একটী যুবক ভিস্যুভিয়াস্ ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীর আফিস হইতে ৫০০৲ টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করে। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে ভোলানাথ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে ও বিচারে তাহার দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।"

কর্ত্তার হাত হইতে কাগজখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। তাঁহার নত মস্তক লজ্জায় ঘৃণায় আরও নোয়াইয়া পড়িল। নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

[৭]

পিতার কঠিন প্রাণেও পুত্রস্নেহ যে সমস্ত কাঠিন্যকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বজয়ী হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়,—এটা যে খুবই স্বাভাবিক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কর্ত্তা পুনরায় আজ, জেল হইতে লিখিত ভোলানাথের পত্রখানি লইয়া বড় করুণ ও মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে পড়িতেছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার বিবেকবুদ্ধি কূট তর্কে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিল,—পুত্র চুরি কোরে পিতার ঋণশোধ কোরবে—এ বোঝাটা কি খুব ভাল বোঝা, না—সম্পূর্ণ ভুল বোঝা। তার চেয়ে পিতার চুল বিকিয়ে যায় সেওভি আচ্ছা। কি অপমান, কি লজ্জা, চুরি কোরে দেনা শোধ? আমার পুত্র চোর? ছি-ছি ছি! পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়। কর্ত্তা পত্রখানাকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

[৮]

কর্ত্তার এই লজ্জা অপমানের মাঝে সংবাদ পত্র পুনরায় সংবাদ আনিয়া দিল—'ভোলানাথ রক্তামাশয় রোগে জেলেতেই মারা গিয়াছে।'

ধীরভাবে কর্ত্তা সংবাদটি শুনিলেন। ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় বসিলেন। ঠিক বলিতে পারি না তখনও তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল কি না।

আজ আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আর আমার কোন চিন্তা,

কোন বাধা বন্ধন নাই। আর আমার লোকের কথা শুন্‌তে হবে না। আর আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। পুত্র কুকর্ম্ম কোরবে, দায়ী হবো আমি; কেননা আমি পুত্রের পিতা লোকের চাহনিতে যেন তার জন্য একটা সন্তোষজনক কৈফি-য়ৎ। কিন্তু এখন আমি নিষ্কণ্টক। আর আমি চোরের পিতা নই। ভুলু বোলে? কেউ আর আমার পুত্র নাই। আজ আমি ঋণমুক্ত, বন্ধনমুক্ত, দায়মুক্ত। এমন দিনে গিন্নী নাই? দাঁড়াও গিন্নি! তোমার ভুলুর শেষ সংবাদটা নিয়ে আমি যাই। নারায়ণ আর কেন? আমায় পার কোরে দাও। কুপুত্রের বিনিময়ে আজ আমি ঋণমুক্ত। বাবা ভুলু! তুই ক্ষমার যোগ্য কিনা, তা মীমাংসা কোরতে পারলাম না।—পাষাণ গলিয়া 'দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। একখানা মোটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া কর্ত্তা শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। নির্জ্জনে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে দ্বারে আসিয়া একজন বৈরাগী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিল—"কোথায় রে বাপ্ ও নীলমণি, মা বোলে আয় কোলে কোরি।"